

সং গুরু লাভ ।

বালাকাল হইতে আমার সংসারের প্রতি বৈরাগ্য । কিকপে ভগবৎ লাভ হবে এই চিন্তায় মনকে সর্বদাই ব্যাকুল করিত । আমার বাবা, মা, মরাসী গুরুন নিকট দীক্ষা লইয়া সংসাবেব মধ্যে থাকিয়া যোগ সাধন করিতেন । আমার ব্যাকুলতা দেখিয়া তাহাদের মনে বড়ই আনন্দ হইত, তাহারা বলিতেন ভগবৎ ভক্ত সন্তান সমুত্তি পিতা মাতার প্রার্থনীয় । আশীর্বাদ করি এই ভগবৎ ভক্তি দিন দিন বৃদ্ধি হউক তাহাব চরণে আত্ম সমর্পণ করিয়া চিব শান্তি লাভ করিও । তাহাদের উপদেশ অনুযায়ী বালাকাল হইতে ভগবৎ চিন্তা করিতাম । পিতা মাতা স্বর্গলাভের পর সেই বৈরাগ্য ব্যাকুলতা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল ।

একদিন আমাদের বাড়ীতে ভগবৎ পাঠ হইয়া চল; সেই সময় অনেক সাধু মহাপুরুষ আদিয়াছিলেন । সে এক ঈশ্বরের দিন তাহাদের সেবা যত্ন করিয়া কত আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম । আমার শরীর সর্বদাই অসুস্থ থাকিত, শুনেছিলাম চন্দ্রায়ণ করিলে দেহ পবিত্র ও বাণী শূণ্য হয় সেই আশায় আমি চন্দ্রায়ণের আয়োজন করিয়াছিলাম । একটা মহাপুরুষ বলিলেন “মা, চন্দ্রায়ণ অপেক্ষা দীক্ষা নিলে শরীর ও মনে শান্তি পাবে” । তখন আমার সং গুরু লাভের সময় হয় নাই, তাই আমার মনে হল কুল

গুরু ভাগ করিতে নাই। এখন কুল গুরু উপস্থিত নাই কিকপে দীক্ষা হবে। সেই মহা পুরুষ চলে যাবার পর আমার প্রাণে ভয়ানক অশান্তি বোধ হল, আমি যেন কি এক মহারত্ন হারিয়ে পাগলের মত হইলাম। গীতায় আছে সং গুরুর কাছে শিক্ষা লইবে, সেই সং গুরু আমি ধরে পেয়ে দীক্ষা লইলাম না আমার কি দুর্ভাগ্য। অহার নাই, নিদ্রা নাই, প্রাণে শান্তি নাই দিবা নিশি ঐ এক চিন্তা কোথায় গেলে তাঁর দর্শন পাব। ছয় মাস আমি কি নিদারুণ যাতনা ভোগ করিয়াছি তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

ছয় মাস পরে আমরা কলিকাতায় গিয়াছিলাম সেট সময় একদিন আমার দাদার সঙ্গে সেট মহাপুরুষের দেখা হয়, দাদা আমার অবস্থা জানিতেন তিনি বলিলেন আপনি চলে আসার পর সে আপনার কাছে দীক্ষা লইবার জগা পাগলের মত হয়েছে। তিনি জাসিয়া বলিলেন সময় না হলে কিছুই হয় না অক্ষয় তৃতীয়ার দিন খুব ভাল সেই দিন ৩মি তাকে নিয়ে আমার আশ্রমে এস দীক্ষা দিব।

দাদা যখন এসে এই সব কথা বলিলেন তখন আমার প্রাণে কত আনন্দ হ'ল করুণাময় অনুরোধমী রূপে আমার অন্তরের সব বেদনা বুঝে তাই দেখা দিয়ে শান্তির বিধান করলেন। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন আমার সং গুরুলাভ হ'ল।

দীক্ষার পর আরও দুইবার তাঁর শ্রীচরণ দর্শন পাইয়াছিলাম। শেষ বারে তিনি গয়ায় আসিয়া দাদাকে দীক্ষা দিয়া

হিমালয় যাবা করিলেন। আমাকে যোগের বিষয় সমস্ত লিখিয়া দিলেন। আমি বলিলাম বাবা যোগের বিষয় আর কিছু লিখিয়া দিন। কি স্তম্ভর হাসি হাসিয়া বলিলেন “মা, পালানে গুরু বলে বুঝি সব পুটলী দে দে নিতে চাও? তা হয় না মা, ধীরে সাধনার পথে চলতে হয়। মা, আমি হিমালয় যাব সেইজন্য বুঝি তোমার চিন্তা হয়েছে। মা, আমি হিমালয় থাকি আর যেখানেই থাকি তোমার যখন যা আশঙ্ক হবে তুমি পাবে। তোমার ঐকান্তিক গুরুভক্তি বলে আমি বোঝি তুমি মা ব্রহ্মময়ীকে পেয়ে চির আনন্দময়ী হবে, তোমার কোন অভাব থাকবে না”।

সেই বর্ষেকের উপর বিশ্বাস করে আজ ৩৭৩৮ বৎসর আমি সাধনার পথে চলছি। আমি জানি, আমার গুরুবাক্য কখনও মিথ্যা হবেনা। আমি কখন কোন সাধু-সন্ন্যাসীর নিকট কোন ক্রীড়া লই নাই। আমার গুরুদেব যাহা দিয়াছিলেন তাহাই সাধনা করিয়াছি। আমার যখন যাহা পাইবার সময় আছে গুরুর রূপায় আমি তাহা লাভ করিয়াছি। দয়াময় গুরুদেবের অপার ককণা তিনি আমার হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে “যোগমার্গ সোপানে” উত্তোলন করিয়াছেন। গুরুদেব বলিয়া ছিলেন “মা, যখন তোমার ভক্তরের তীর্থ দর্শন হবে, সেই সময় একবার বাহিরের তীর্থ দর্শন করিও, আর হোম করিও”।

আমি বলিলাম বাবা আমি কাজালিগা, আপনি দয়া করিয়া সময় বুঝিয়া লইয়া যাইবেন। সেই গুরু-রূপে আমার তীর্থ দর্শন। সেইজন্য গুরুদত্ত “আনন্দময়ী” নাম এই পুস্তকে দিলাম।

কেন গুরুদেব হোম করিতে বলিয়াছিলেন, তাহার ভাবার্থ তখন বুঝি নাই এখন এইটুকু বুঝিলাম, নিভা জ্ঞানায়িতে কাহনা, বাসনা, চিন্তা, ভয়, দুর্বলতা, মায়া, মমতা, পাপ, পুণ্য, জ্ঞান, অজ্ঞান, যা কিছু আছে, ইন্দ্রিয়বৃত্তি সমুদয় আত্মতী দিয়া আপনাকে শুক পান্ন-পন্থে লীন করিতে হইবে। সেইজন্যই গুরুদেবের এই হোমের আদেশ।

সাধনার পথে কত ঘাৎ, প্রতিঘাৎ, বিঘ্ন, বিপদ সহিতে হয়। গুরুদেব এ দাসীকে কত রকম পরীক্ষা করিয়াছিলেন তিনিই আবার দয়া করিয়া সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিয়াছেন। তাঁহার অপার করুণা ভাষায় ব্যক্ত করা যায়না।

গুরুদেবের অপার মহীমা অনেকবার অনুভব করিছি, একবার এমন একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না।

একদিন আমার একটা প্রাণের বন্ধু আমাকে বলিলেন ভাই, গোরক্ষগীতে একটা মহাপুরুষ আছেন তাঁকে দর্শন করিতে যাবে? আমি বলিলাম সাধু-মহাপুরুষ দর্শন করিব সেও অনেক সৌভাগ্যের কথা—যাইব।

গোরক্ষগী বাবার আশ্রমে গেলাম, কি সুন্দর মনোহর আশ্রম চারিদিকে নানাবিধ ফল ফুলের বাগান, শিবের মন্দির, তাহার পার্শ্বে সুরহং আশ্রম। একখানি খুব বড় ঘর সেই ঘরে বেদীর উপর বাবা বসিয়া আছেন, বাবার আনন্দের মূর্ত্তী দেখিয়া মনে পড়িল কালীর ভাঙ্করানন্দ স্বামীকে এ মূর্ত্তীতে সে মূর্ত্তীতে কোন প্রভেদ নাই।

আমরা গিয়া বাবার চরণে প্রণাম করিলাম। আমার বন্ধু বলিলেন “বাবা ইনি আমার বন্ধু, ইঁহাকে কিছু ক্রীয়া দিতে হবে”।

বাবা বলিলেন না ক্রীয়া দিবনা। আমার বন্ধু বলিলেন “কেন বাবা আপনিত অনেককে ক্রীয়া দিয়াছেন তবে ইঁহাকে কেন দিবেন না”। বাবা বলিলেন আমার ইচ্ছা। তারপর আমাকে একা একটা ঘরে লইয়া গিয়া বলিলেন, “মা তোমাকে ক্রীয়া দিবনা বলেছি সেজ্ঞা কি তোমাব মনে কন্ট হয়েছে” ? আমি বলিলাম না বাবা আমাব মনে কন্ট হয় নাই, আমার গুরুদেব আমার কোন অভাব বাঞ্ছেন নাই। আমি শুধু অপনার চরণ দর্শন করিতে আসিয়াছি। বাবা বলিলেন মা তোমার গুরুদেব তোমাকে উত্তম পথ দেখাইয়া দিয়াছেন, তুমিও ঠিক পথে চলিতেছ। মা, আমিও গুরুগিরি করিতে আসি নাই। তুমি ব্রহ্মযোনি পাহাড়ে উঠিতেছ, তোমাব ২৪ টা সিঁড়ি বাকি আছে, আমি তোমাকে বলিব এটা ব্রহ্মযোনি নয়, তুমি যে এস, তোমাকে নামাইয়া সমস্ত সত্ত্ব ঘুরাইয়া আবার এইখানে আনিব তাহাতে তোমার কত কন্ট হবে ? সেইজন্যই বলিলাম আমি ক্রীয়া দিবনা। মা, তোমাকে আমি একটা কথা বলিতেছি তাহা মনে রাখিও কোন সাধুর কাছে কোন ক্রীয়া লইও না। অনেক ভণ্ড সাধু আছে, গুরুগিরি করিবার জ্ঞান তোমাকে কন্ট দিবে, সেইজন্য তোমাকে সাবধান করিয়া দিলাম।

সন্ধ্যাই তাঁর চরণ দর্শন করিতে যাইতাম, তাঁর অপাব ককণায় প্রাণে বড়ই শান্তি পাইতাম।

এখন সে দয়াময় মহাপুরুষ এ জগতে নাই।

গুরুর রূপায় তীর্থ দর্শন ।

শ্রীশ্রীঅভয়ানন্দ স্বামী গুরুদেব চরণে
ভকতি কুস্তম মালা করি নিবেদন ।

শ্রী গুরু চরণে করি আত্ম সমর্পণ ।
শ্রী চরণে যেন সদা থাকে মম মন ॥
গু নের অতিত তুমি শ্রীগুরু আমার ।
ক কাবে আলোকি আছ নিখিল সংসার ॥
দে খা দিও এ দাসীরে অন্তিম সময়ে ।
ব লিতেছি এষ্ট মম কামনা জন্ময়ে ॥
চ ন্দন ভকিতে ঘষি লয়ে স্নেহতনে ।
ব জিব চরণ তব এই সদা মনে ॥
গে হারি রক্তিম পদ ধরে প্রেম জল ।
ভ ব পাবানারে “গুরু চরণ সঞ্চল” ॥
ক নন বঞ্চিতা যেন না হই রূপায় ।
তি মীরে আবৃত মম এ’ শঙ্ক জন্ময়ে ॥
ক নাসনা দূর করি থেক সদা পাশে ।
স খ দুঃখ বুচাইও সব অভিলাষে ॥
ম ম ভক্তি পদ্মাজলী গুরু রূপা কলে ।
মা লা গাঁথি দিব তব ও চরণ তলে ॥
লা ঘন হয়েছি সব গুরুর রূপায় ।
ক কণা অপার তব বর্ণনা না যায় ॥
রি ক্ত জন্ময়ে মম নাহি কিছু হায় ।
নি বেদিন তব দেব ওই রাজ্য পায় ॥
বে দনা ব্যাধিত চিন্তে “শ্রীগুরু আমার” ।
দ য়া কোরে দিলে কত ককণা অপার ॥
ন তুবা কি হ’ত মম ভাবি বার বার ।
ভব পারাবারে তুমি হও কর্ণধার ॥

গুরু রূপা ।

পতিত পাবন দীনবন্ধু দয়াময়,
ভাবিয়ে ককণা তব শীহরে হৃদয় ।
কান্সালিণা বলে দেব কত ভালবা ।
যখন যা মনে হয় পুরাও সে ।
স্থূল দেহে যবে তুমি লইলে ।
কাঁদিয়ে পড়ি শু তল লুটাইয়ে ।
চির অভাগিনী আমি কেহ' গািহ হায়
দয়া ক'রে দিলে প্রভু চরণে আশ্রয় ।
চরণ বক্ষিতা মোরে কো'রনা কখন,
গুরু পাদ্য-পদ্ম শুধু ভরসা এখন ।
কি মধুর মেহভাষে বুঝাওলে মোরে
কেন মা, ব্যাকুল হই' না দিছ কাতবে ?
'দিয়েছি যে "যোগ নীয়া" সেই যোগ ধ্যানে
গুরুপদ সদা তুমি হেরিবে নয়নে ।
ঐকান্তিক গুরুভক্তি আছে যার প্রাণে
সেই শিষ্য থাকে সদা গুরু সন্নিধানে ।
গুরু পাদ্য পদ্ম তুমি ক'রয়াছ সার
কিছুরি অভাব তব রহিবেনা আর,
"জগদম্বা" মাকে তুমি পাইবে দরায়
অবাধ না হবে কভু জানিবে নিশ্চয় ।
দক্ষিণা স্বরূপ তব কামনা বাসনা,
লইয়াছি আমি সব করি নির্বাসনা ।

ভিতরের তীর্থ যবে করিবে দর্শন,
 বাহিরের তীর্থ তবে করিবে ভ্রমণ।
 অন্তরে বাহিরে তব হবে একাকার
 তখনি বুঝিবে তুমি “অনিতা” সংসার,
 নিত্যানন্দে লভি হবে নিত্যানন্দময়া”
 গুরু দত্ত নাম তব থাকিবেক ওই।
 “হিমালয়” যাব বলি ভাগিতেছ মান
 বকিতা হইবে তবে গুরু দরশনে ?
 গুরু তব অন্তরেতে থাকিয়ে “জাগ্রত”
 কাটাবেন “মায়ামোহ” বাসনা নিয়ত।
 বিশ্বাসে নির্ভর করি থাক সৰ্বক্ষণ
 গুরুবাক্য কভু নাহি হইবে লঙ্ঘন।
 অপার “গুরুর কৃপা” বণিতে না পারি
 বহু পূণ্যে পাইয়াছি গুরু পদ তরী।
 ধন্য মম গুরুদেব ধন্য কৃপা তাঁর
 সঞ্চিত বাসনা যত অন্তরে আমার।
 একে একে পূর্ণ করি বাসনা সকল
 “নির্বাসনা” জদি আজি শান্তি নরমল।
 কি আনন্দ লভিয়াছি গুরুর কৃপায়,
 গুরু-কৃপা কভু নাহি বর্ণনা না যায়।

অবতরণিকা ।

বর্তমান কালে বঙ্গ ও অগ্গাঞ্চ প্রদেশে বিদ্যমী মহিলাগণের সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে । নানাবিধ বিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানবিস্তারও যথেষ্ট হইতেছে । কিন্তু রমণীকে যে উদ্দেশ্যে ও কারণে পুরুষের “মহাশিক্ষা” “অক্ষাঙ্গী” “জীবনসঙ্গী” ও “গৃহিণী” ইত্যাদি বাক্যে অলঙ্কৃত করা হয়, তদুদ্দেশ্যে জ্ঞান-বিস্তার ও শিক্ষা কিসকপ হইতেছে তাহা উপলব্ধি কর বড় সুকঠিন । বর্তমান কালে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে বাস্তবিক কিসকপ জ্ঞান, নীতি ও ধর্মশিক্ষার আবশ্যক তাহাই এখন বিষম সমস্যা । একেত বর্তমান কালে পুরুষদিগের শিক্ষাপদ্ধতি একপ্রকার ধর্ম ও অমুষ্ঠানাদির অভ্যাসশিক্ষা বশীভূত । তাহার উপর নারীশিক্ষার লক্ষ্য যদি সেই প্রকার হয়, তাহা হইলে তাহার পরিণাম বিশেষ ভাবে চিন্তনীয় ও বিচারণীয় - উভয় পক্ষের শিক্ষাবিষয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রণীতির সহিত জড়িত থাকিবে । উভয় প্রকার শিক্ষার মধ্যে কতটুকু বরণীয় ও কতটুকু বর্জনীয় তাহা এই সময়ে স্ত্রীগণের বিশেষভাবে চিন্তা ও অমুষ্ঠান করিবার কথা । জ্ঞানশিক্ষা ও অমুষ্ঠানের সহিত ধর্ম্যকর্মা শিক্ষার সম্মিলন ক্রমশঃ দিন দিন বিরল হইয়া পড়িতেছে ।

লেখিকা কোন প্রকার বিদ্যালয় বা কোন শিক্ষকের অধীনে শিক্ষিতা নহেন। সীম পিতা মাতা ও আত্মীয় স্বজনগণের যত্নে ও উৎসাহে উত্তরোত্তর জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। অথচ গুরুজনদিগের প্রবর্তনায় এই শিক্ষার সঙ্গে ২ তাঁহার গৃহস্থলী নানাবিধ সংসার পরিদর্শন কাব্যে যোগাতা এবং ধর্মশিক্ষা ভাব ক্রমশই পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। একাধানে তাহার এতগুলি গুণের সমাধান এবং তাঁহার প্রগাঢ় গুরুভক্তি, ধর্মোষ্ঠান ও লিখনে তাঁহার ভাব প্রকাশ ও ঐটুকু শিক্ষায় ঐরূপ লিখিবার ভনিতা দেখিয়া এতই মুগ্ধ হইয়াছি যে এই “অবতবনিকা” টুকু না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না।

যদি আপনাবা বিদুষী বমণীয়া গ্রন্থে ও পবিত্রাদিতে ভ্রমণ বৃত্তান্ত এইরূপ জ্ঞানের সহিত ধর্মভাব ফুটাইতে পারেন—যদি কীর্ত্যাত্রিদিগের তীর্থ-ভ্রমণে মনকে প্রস্তুত করণ বিষয়ে অজ্ঞান্য পথের বিষয়ে এই গ্রন্থ যদি কিছুমাত্র সহায়তা করিতে পারে, তাহা হইলে লেখিকার শ্রম সার্থক হইবে সন্দেহ নাই।

আর সঙ্গদয় পাঠক-পাঠিকাগণ যদি নিজগুণে ক্ষমা করিয়া ভ্রমগুলি সংশোধন করিয়া লয়েন; তাহা হইলে ‘তিনি চির কৃতজ্ঞা রহিবেন সন্দেহ নাই। অলমিতি বিস্তারেন।

ক্রীশ্নরেশ চন্দ্র ঘোষ।

ভূমিকা।

শ্রীগুরু রূপায় তীর্থদর্শন লিখিবাব ইচ্ছা আমার অনেক দিন হইতে ছিল, কিন্তু এত শীঘ্র যে লেখা হইবে তাহা কখন আশা করি নাই।

শ্রদ্ধাম্পাদ সোদর প্রতিম শ্রীযুক্ত বাবু সুরেশ চন্দ্র ঘোষ জেলা স্কুলের অবসর প্রাপ্ত ছেড় মাস্টার মহাশয় এ বিষয়ে উৎসাহ ও মার্গ প্রদর্শন না করিলে ইহা সম্পন্ন হইয়া উঠিত না। তাঁহারই আদেশে, চেষ্টায়, যত্নে ও তিনি পুস্তকের প্রথম সংশোধনের প্রভৃতি কান্যে সহায়তায় এত শীঘ্র পুস্তক জন সাধারণে প্রকাশিত করিতে সমর্থ হইয়াছি।

আজমীর, জয়পুর, ককেশ্বরে এ কয়েকটি স্থানের লেখা খুব কম হইয়াছে। কারণ, আমি তাঁহাদের সঙ্গে তীর্থ দর্শনে গিয়াছিলাম, তাঁহারা এ সব স্থানে এক বেলা কিংবা একদিন থাকিয়া যে টুকু দেখা আবশ্যিক সেই টুকু মাত্র দর্শনাদি করিয়াছিলাম, আমিও তাহাদের সঙ্গে ছাডিয়া আর কতাপীও যাইতে ও দেখিতে পারি নাই। সেইজন্য পুস্তকে সেট অল্প টুকু মাত্র লেখা হইয়াছে। প্রসিদ্ধ স্থানের চারিদিকে ভ্রমণ না করিলে সেই স্থানের বর্ণনা করা যায় না। সেইজন্য পুস্তকের যদি কোন দোষ হইয়া থাকে পাঠক পাঠিকাগণ নিজ গুণে ক্ষমা করিবেন।

বদিনারায়ণের আমরা সকলেই নৃতন যাত্রী চটা ও মাইল পাশা ও ছিড়িবাদের মুখে যেকপ শুনিযাছি সেইকপ লেখা হইয়াছে, ইত্যাতঃ কঃ .শা হইতে পারে।

বদিনারায়ণের পথের সন্মেলন দৃশ্যাবলী পথেই বসিয়া লিখিতে পারলে অত্যন্ত মনোহর হইত। কিন্তু আমরা শুদ্ধ কালে দর্শন করিব বলিয়া প্রাণপণে চলিয়া ছিলাম। কোথাও একটু বিশ্রাম কর নাহ। স্টার সময় চলিতে আরম্ভ করিতাম, বেলা ১২টার সময় একটা চা.ও রন্ধন আহারাদি করিয়া আবার চলিতাম, সন্ধ্যার সময় চটাতে আসিয়া বিশ্রাম করিতাম। সেইজন্যই বোধহয় সকল কথা ও ভাব ভাল কপ ফুটে নাই।

আশাকরি সদাশয় পাঠক পঠিকাগণ এ স্বচ্ছ লেখিকার লেখাকে স্নেহের চক্ষে দেখিয়া যে সমস্ত ভুল আছে সে সমুদয় ক্ষুণ্ণ করিয়া সংশোধন করিয়া লইবেন।

পরিশেষে বলুবা এই যে মং প্রণাও ক্ষুদ্র পুস্তিক খানি যদি কোন ভীথযাত্রীগণের কি কংমাত্র উপকারে বা কানো লাগিয়া থাকে, তাহা হলে এই সকল শ্রম সাপক মনে করিব।

ত্রিমতী আনন্দময়ী দেবী।

তীৰ্থাদিৰ সূচীপত্ৰ ।

১ । কালীঘাট ।	২৬ । ব্ৰীহৎগৰ ।
২ । গঙ্গাসাগৰ ।	২৭ । কদ প্ৰয়াগ ।
৩ । দক্ষিণেশ্বৰ ও আৰ্দ্ধাৰ্দ্ধাট ।	২৮ । শুভ্ৰ কাশী ।
৪ । ভাৰুকনাথ ।	২৯ । বিষ্ণুগো নাৰায়ণ ।
৫ । নবদীপ ।	৩০ । গোৱী কণ্ড ।
৬ । পুৰুষোত্তম ।	৩১ । কেদাৰ নাথ ।
৭ । ভুবনেশ্বৰ ও উদয়গিৰি ।	৩২ । উদ্যমঠ ।
৮ । বেজনাথ ।	৩৩ । ভৃগুনাথ ।
৯ । বিষ্ণাটল ।	৩৪ । যোশীমঠ ।
১০ । এলাহাবাদ ।	৩৫ । গকড় গঙ্গা ।
১১ । আজমীড় ।	৩৬ । বিষ্ণু প্ৰয়াগ ।
১২ । পুৰুষ সাবিত্ৰী পাহাড় ।	৩৭ । পাতল গঙ্গা ।
১৩ । কুৰুক্ষেত্ৰ ।	৩৮ । পাণ্ডুকেশ্বৰ ।
১৪ । জয়দেব ।	৩৯ । বহিনাৰায়ণ ।
১৫ । মথুৰা ।	৪০ । নন্দ প্ৰয়াগ ।
১৬ । বৃন্দাবন ।	৪১ । কৰ্ণ প্ৰয়াগ ।
১৭ । অশোখা ।	৪২ । ৰামনগৰ ।
১৮ । কাশী ।	৪৩ । নৈমিষাৰণ ।
১৯ । গয়া ।	৪৪ । কাশী ।
২০ । পশুপতিনাথ ।	৪৫ । ৰাজগৃহ ও নন্দ ।
২১ । হৰিদ্বাৰ ।	৪৬ । বৰেশ্বৰ ।
২২ । অম্বিকেশ ।	৪৭ । জয়দেব ।
২৩ । লছমন ঝোলা ।	৪৮ । কামাৰ্দ্ধ ।
২৪ । দেবপ্ৰয়াগ ।	৪৯ । ৩ চন্দ্ৰনাথ ।
২৫ । বিষ্ণুকেদাৰ ।	

কলিকাতার কালীঘাট দর্শন ।

কালীঘাট ঘাইতে কোন কষ্ট নাই । হাওড়া স্টেশন হইতে যায় ৫ মাইল দূরে । হাওড়া হইতে কালীঘাট ঘাইতে ট্রাম, বাস, ঘাড়ার গাড়ী সমস্তই পাওয়া যায় ।

কালীঘাটে মা কালীর মন্দির আছে । কালীঘাটের কালীমাতা ২১টি পীঠস্থানের ১টি পীঠস্থান । এখানে সতীর দক্ষিণ পদের চারিটি অঙ্গুলী পড়িয়াছিল ।

মন্দিরটী বৃহৎ, দেবিতে অতি সুন্দর । মন্দিরের ভিতরে মা কালী চতুর্ভুজা, ত্রিনেত্রা, রক্তবস্ত্র—পরিহিতা, লোলজিহ্বা, মুক্তকেশী, ভক্তবান্ধা পূর্ণ-কারিণী, সদা-হাস্যবুদ্ভা মা, মন্দির আলো করিয়া বিরাজ করিতেছেন । মায়ের এই আনন্দময়ী মূর্তি দেখিলে ভক্ত হৃদয় আনন্দে আগ্রহারা হইয়া মায়ের পায় - পদ্মে লীন হইতে চায় ।

মা, যেমন কালী মূর্তিতে ভূবন আলো কবিরাজ, তেমনি আমার হৃদয়ের সব অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিয়া, জ্ঞানের আলোকে আলোকিত কর মা ! মা, প্রত্যহ তোমার কাছে কত বলিদান হইতেছে, । তোমার “বলির” বিধান দেখিয়া বলিতেছি মা ! তুমি দয়া করিয়া আমার সব বড় রিপু গুলিকে বলিরূপে গ্রহণ কর মা ! মন্দিরে বসিয়া দেখি কত লোক সমারোহ করিয়া কত অয়োজন করিয়া তোমার পূজা করিতেছে । আমারত মা কিছুই নেই, আমি কি দিয়া তোমার পূজা করিব ? তবে যদি দয়া করিয়া একটু শ্রদ্ধা

ভক্তি দাত, তাহা ইহলে সেই ভক্তি-প্রেম-অশ্রুজল গঙ্গাজল রূপে
তোমার রাস্তা চরণ ধৌত করিয়া মনজবা বাসনা নিয়ে তোমার
পাদ পদে পুষ্পাঞ্জলী দিব। অন্তরের কামনা, বাসনা, আমিহ,
অতঃপাৱ এই সব দিয়া আমার জগত জননী মহাশক্তি রূপিনী
মায়ের পূজা করিতে চাই মা।

আলো কোরে কে মা তুমি ভুবন মেহিনী ?

কালীঘাটে বিরাজিছ করাল বদনী।

তোমার চরণ আশে, এসেছি মা তব পাশে,

যা কিছু আছে মা দিতে চবণে তোমার,

আনিয়া ছি অতঃপাৱ আমিহ আমার।

কাম, কোপ, বিদ্রুগণে, এনেছি মা বলিদানে,

ভক্তি চন্দন দিয়ে মনজবা কুলে,

পুষ্পাঞ্জলী দিব মাগো ও চরণ তলে।

মম প্রেম - অশ্রুজল, হবে তায় গঙ্গা জল,

ধুইব চরণ তব বড আশ মনে,

তনয়ার পূজা মাগো লভ' কৃপা গুণে।

মা কালীর মন্দিরের পাশে শ্যামসুন্দরের মন্দির। শ্যামসুন্দর
প্রেমময় মূর্তিতে যুগলরূপে বিরাজ করিতেছেন।

মন্দিরের সম্মুখে আদি-গঙ্গা আছে। আদি-গঙ্গা স্রানে
বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। ভাগীরথী আগে এটি ঝড়ি দিয়া
বহিতেছিলেন, তাই আজিও সেই ধারণা এখন বজায় রহিয়াছে।

মন্দিরের বাহিরে ও মন্দিরের প্রাঙ্গণের মধ্যে অনেক ফুলমালা ও ডালার দোকান আছে। মায়ের পূজা, যাঁহার যেমন ইচ্ছা, সে সেই রকম পূজা দিয়া থাকেন। কেহ ১০ আনার, কেহ ১৫ পয়সার ডালা দিয়া পূজা দেয়। ডালাতে কতকগুলি কলের কচা, সন্দেশ, ২১ টা পাতায় একটু সিঁতুর থাকে। বেকশ ১০ ভোগের জন্য দেয়। আর যাঁহারা সেকপ মানসিক পত্রা দিতে আসেন তাহাদের যাঁহা সেকপ মানসিক সেইরকম পত্রা দিয়া থাকেন, যথা—ভাগ নল, খাঁটা খাটী, নং, জবাব নং, মামের ভোগ ইত্যাদি।

মায়ের মন্দিরে প্রবেশের সময় দলজান কাছে পানান দাড়াইয় থাকেন পয়সা না দিলে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেন না। পান দিগকে ২১ টা পয়সা দিতেই হয়।

কালীম তা দর্শন করিয়া নবুলেশ্বর দর্শন করিতে হয়। নবুলেশ্বরের মন্দিরে নিকট ফুল সেলপাতা ভাঁড়িতে ৫০ গজাজল দেয় হয়। তাহা লইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দর্শন, পূজাদি করিতে হয়।

আগ্নি মাসে দুগা পূজার সময় মা কালীর মন্দিরে পূজার সমানোহ দেখিতে বড়ই সুন্দর। মার্চমাস দিন অসংখ্য বলি হয়। পূজার দশো নাটামন্দির ভরিয়া যায়। তিন দিন সর্কফণ লোকের ভীড়, সমস্ত দিন মায়ের পূজা হইতেছে। বিজয়া দশমীর দিন সিঁতুর খেলা দেখিতে বড়ই সুন্দর। সেদিন কালো মা, একবারে রাজা হ'ল। বিজয়ার দিন সকাল হইতে রাবি ৮৯ টা পদাশু মেয়েদের ভীড়, মেয়েরা সকলে সিঁতুর মায়ের

কপালে দিয়া তারপর মেয়েরা সিঁদুর লইয়া সমস্ত সখবা মেয়েয়ে

সিঁদুিতে সিঁদুর দিয়া সিঁদুর খেলা করে। বিজয়ার দিন নাট্যমন্দিরে নানাবিধ দ্রব্য,—শাঁখা, শাড়ী, আরসী, চিকুণী, আলতা, মাথাঘষা, পানের মসলা ইত্যাদি ডালায় করিয়া সাজান হয়।

কালীঘাটে আজকাল অনেক হালদারগণ যাত্রীদের প্রতি গুণ যত্ন করিয়া দর্শনাদি করান। আবার অনেক অর্থ লোলুপ পাণ্ডা আছেন; তাঁহারা যাত্রীদের প্রতি যৎপরোনাস্তিক পীড়ন করেন।

কালীঘাটের পশ্চিমে ভূকৈলাসের রাজভবন ও ভূকৈলাসের শিব মন্দির আছে।

কলিকাতা বাসিনী রমণীরা পৌষ মাসে ও চৈত্র মাসে মায়ে দর্শনাদি করিয়া থাকেন। সাগর মেলায় পূর্বের খুব ভিড় হয়। আর দ্বীপাস্থিতা অমাবস্তার দিনে ভিড়ের ত কথাই নাই।

গঙ্গাসাগর !

গঙ্গাসাগরে আমরা ডায়মণ্ড হারবার হইতে নৌকায় গিয়াছিলাম। বেলা ২ টার সময় নৌকা ছাড়িল।

গঙ্গার কিনারে কিনারে নৌকা ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। আমি মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলাম “নৌকা এত ধীরে ধীরে যাইতেছে, এ নৌকাকবে পৌঁছিবে?” মাঝি বলিল “এরূপ ভাবে নৌকা চলিলে ২৩ দিন লাগিবে। আর মাঝ গঙ্গা দিয়া নৌকা বাহিলে আজ রাত্রেই পৌঁছিবে। মাঝ গঙ্গা দিয়া নৌকা

জইয়া গেলে, তরঙ্গ দেখিয়া অনেক আরোহী ভয় পায়, সেইজন্য
কিনারে নৌকা বাহিতেছি ” ।

মানুষ চিরদিন সংসার সমুদ্রে হাবু ডুবু খাইতেছে । সেসময়ত
মনে ভাবেনা ভগবানের চরণ কিনারা ধরিয়া সংসার সমুদ্রে ভাসি,
তাহা হইলেত আর জীবন ভরীর কোন ভয় থাকিবেনা ।

আমি মাঝিকে বলিলাম, এখনত কোন জাহাজ বা স্টীমার
নাই, এসময়ে যদি নৌকার কোন ভয় না থাকে তাহা হইলে
তুমি গঙ্গার মাঝ দিয়া নৌকা বাহিয়া চল ।

আমার কথা শুনিয়া মাঝির খুব আনন্দ । যত শীঘ্র পৌছিতে
পারে, তার পক্ষে ভাল । মাঝি মাঝ গঙ্গার নৌকা
বাহিতে লাগিল ।

আরোহীরা সকলে শয়ন করিয়াছেন । আমি সে সময়
নৌকার ছাদে আসিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিলাম, টাঁদের আলোতে
গঙ্গার কি অপূর্ব শোভা হইয়াছে । তাহা দেখিয়া মন বিবোহিত
হয়, মনে হয় বুঝি প্রকৃতির সমস্ত শোভা এই গঙ্গার জলে ।

টাঁদের কিরণ বিকীর্ণ হইতেছে । যখন নৌকা মাঝ গঙ্গার
আসিল, তখন গঙ্গার কূল কিনারা কিছুই দেখা যায় নাই ।
কেবল মাত্র মাথার উপর অনন্ত সুনীল আকাশে বৃহৎ চন্দ্রমা
হাঁসিতেছে । এত বড় টাঁদ আমরা কখন ঘরে বসিয়া দেখি নাট,
টাঁদ যেন এক খান্য বড় আলোর মত । আর গঙ্গার উপর নৌকা
খানি যেন ঠিক ঘোটার খোলার মত,—কখন উঠিতেছে, কখন
ভাসিতেছে । সে সময় আমার প্রাণে যে কি আনন্দময় হইয়াছিল,
তাহা ভাবায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য । সে সময় মনে হইল “আনন্দময় ।

তোমার সসীম হুকু অসীমে লীন হইয়া কি এক অভিনব অসীম
ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছ!—যার আদি অন্ত কিছুই খুঁজে পাওয়া
যায় না।”

সসীম হয়ে অসীমে মিশিলে ।

তুমি সসীম হইয়া, আহা অসীমে মিশিয়া,
অসীম ব্রহ্মাণ্ড ছবি দিয়াছ অঁকিয়া !
তব এ ছবি দে'বলে, প্রেমে মন প্রাণ গলে,
বহিছে তব বারি মন বিমোহিয়া ।
বিমল সাগর, জল, করিতেছে কল কল,
এ ক্ষুদ্র তরঙ্গী তাহে যাইছে ভাসিয়া
এই তরঙ্গ হিলোলে, “তবি” হেলে ঢলে চলে,
মনে হয় তবী বৃক্ষ যাইবে ডুবিয়া ।
ওহে হুম কণধার, তবে কি ভয় নামার,
দিয়েছি জীবন তরী তোমার চরণে,
যায় যদি তরী ডুবে, তব চরণ অর্ণাল,
আমত নিশ্চিন্ত আছি তব পদ ধ্যানে ॥

রাতি ১২ টার সময় নৌকা গঙ্গাসাগরের তীরের নিকট
আসিয়া পৌঁছিল। সে রাতে আমাদের নৌকায় থাকা হইল
পরদিন সূর্যোদয়ের সময় কি অপূর্ব শোভা, মনে হইল সেন
জলের ভিতর হইতে রক্তিমাবর্ণে কত বড় হইয়া সূর্য্যদেব অপূর্ব
ছটায় দীরে দীরে আকাশে উঠিতেছেন।

সকালে আমরা নৌকা হইতে নামিলাম। তাহার পর
লুর উপর হোগলা দিয়া ধর বাঁধা হইল।

কলিকাতা ও নিকটবর্তী স্থান হইতে সমস্ত জিনিষের
দোকান আসে।

পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগরের মেলা হয়, এই
দিনের মেলাতে সাগরদীপের দৃশ্য বালুকাময় মরুভূমি
কেবারে নগরে পরিণত হয়।

নানাবিধ খাদ্যের দোকান, মনোহারী দোকান, কাপড়,
খের ইত্যাদির দোকানের বাজার বসে।

পুলিশ, থানা, তার আফিস, হাসপাতাল, সেবাসমিতি
ভূমি স্থাপিত হয়। অনেক ভলেক্টিয়ার থাকে, সেজন্য যাত্রীদের
পান অশ্রুবিধা ভোগ করিতে হয় না। যদি কেহ হারাঠিয়া যায়,
লেক্টিয়াররা পুঁজিয়া তাহাদের আশ্রয়গণের নিকট পৌঁছাইয়া দেয়।

সঙ্গমে নিকট একটা ঘরের টাটার আশ্রয়ে বহু পুরাতন দ্বা
পিল মূন্নির মূর্তি আছে, দক্ষিণে রাজা ভগীরথের ও বামে
‘মানন্দ জীউর মূর্তি আছে।

যাত্রীরা সঙ্গমে স্নান করিবার সময় সমুদ্রে নারিকেল, কল,
ল, পকরত্ন দিয়া থাকেন ও কপিল মূন্নির দর্শন ও পূজা করেন।

কপিল মূন্নির স্থান হইতে কিছু উত্তরে একটা মিন্ট জলের
ধরিনী আছে, সেই জল সকলের পান করিবার জন্য। সেখানে
কিছু লোক পাহারা দিতেছে, কোন লোক স্নান বা কাপড়
চিিতে পাইবেনা।

ঠাকুরের চরণে পুষ্পাঞ্জলী।

৐ চরণে প্রণিপাত করিয়ে তোমার
 ৐ চরণে যেন মতি থাকে নিরন্তর।
 রা ম কৃষ্ণ রূপে ভূমি আসিয়ে ধরায়
 র ন প্রাণ কেড়ে নিলে সকলের ভায়।
 ক পা করি সর্বজীবে করিয়ে উদ্ধার
 ল মনের ভয় হতে করিলে নিস্তার।
 ন হিলে অগৎ গুরু হইবে কেমনে
 দে বৃত্তা চরণ পূজা করে সর্বজনে।
 ব গিভে না পারে কেহ তব কৃপারালী
 চ রণে আশ্রয় তাই মাগিতেছে দাসী।
 র হিবেনা তব ভয় চরণ কৃপায়
 মে হারি অন্তরে যেন সতত তোমায়।
 ক টাইয়া দাত দেব জ্ঞানের নয়ন
 ল য়ে “পুষ্পাঞ্জলী” করি চরণে অর্পণ।
 মা নসে গুজিয়ে বাসনা কুসুম দিয়ে
 লা যব হউক সব তব পদ পেয়ে।
 নি রবি মন্দির এই সাধন আসন
 বে দনা ব্যাধিত চিত্তে জুড়াবার স্থান।
 দ রাখয় “অবতারে” জীবে করি জ্ঞান
 ন হিলে জীবের গতি কি হ’ত এখন।

দক্ষিণেশ্বরের নিকট আরিয়ারহেঁ আড়াপীঠ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
 দেবের শিষ্য ৬ জনের ঠাকুরকে স্বপ্নাবেশে আদেশ হয় মন্দির করিয়া
 খানে আড়াষাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া ৪টা আশ্রম প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।
 কটী মাতৃ আশ্রম, একটা কুমারী আশ্রম, একটা কুমার আশ্রম,
 খানে বালকদের বিজ্ঞান শিক্ষা ও ধর্মশিক্ষা দেওয়া হয়। কুমারী
 আশ্রমে কুমারী বালিকাগণকে বিজ্ঞান শিক্ষা ধর্ম শিক্ষা ও নানাবিধ
 শিল্প ইত্যাদি দেওয়া হয়, কুমারী আশ্রমে বালিকাদের শিক্ষা
 আচার ব্যবহার দেখিয়া বড়ই আনন্দ অনুভব করিয়াছি, ঠাকুরের
 পায় আশ্রমের দিন দিন উন্নতি হইলে বড়ই সুখ লাভিময় হইবে।
 কল বালক বালিকার পিতা, মাতা বা অভিভাবকগণের কর্তব্য
 প্রথম হইতেই বালক বালিকাগণকে ধর্ম শিক্ষা ও ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা
 দিয়া উন্নত চরিত্র করিয়া তারপর সাংসারিক ও আর্থিক পথ
 প্রদর্শিত করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় পিতা মাতাগণ প্রথম হইতেই
 বালক বালিকাদিগকে সাংসারিক আর্থিক ও ভোগ বিলাসের পথে
 পরিচালিত করিতেছেন ইহার কল যে কি বিষময় হইতেছে তাহা
 বোধ হয় সকলেই অনুভব করিতেছেন ?

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নর - নারীর প্রতি অপার করুণা
 প্রোদেশে মন্দির ও আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া নর - নারীর শান্তির
 বিধান করিয়াছেন। মাতৃ আশ্রমে বিধবা, সধবা, অনাথা সকলের
 স্থান আছে। সন্ন্যাসী আশ্রমের সন্ন্যাসীগণ ভিক্ষা করিয়া
 দানিয়া, মাতৃগণের, কুমারীগণের, কুমারগণের প্রোশাচ্ছাদন, বিজ্ঞা
 ন শিক্ষা, ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতেছেন। এ মহৎ সন্যস্তানে
 সকলের কর্তব্য সাত্বিত্য করা।

তারকনাথ ।

কলিকাতা হইতে পশ্চিমে ৩৬ মাইল দূরে তাবকেপুর। সেওড়াফুলী হইয়া যাইতে হয়। এখানে বাবা তারকনাথের মন্দির, মন্দিরের সম্মুখে নাট্যমন্দির, তাহার পাশে বাবার পুষ্করিণী।

প্রথমে মোহান্তর পূজা হয়। তারপর যাত্রীদের পূজা হয় ১২ টার সময় ভোগ হয়, শৃঙ্গার বেশ হয়। ভোগের পর প্রসাদ মোহান্তর বাড়ী যায়। সেখানে সব সাধু ভোজন হয়।

শিবরাত্রির সময় ও চড়কের সময় তারকনাথে খুব ভীড় হয়।

তারকনাথে বারমাস অনেক নরনারী আসিয়া কটিন বাপি আরোগ্য হইবার জন্য ধন্য দিয়া থাকেন। নাট্যমন্দিরে লোক ভরিয়া যায়, একটুও স্থান থাকে না। অনেক লোক মন্দিরের দরজায় ও মন্দিরের পশ্চাতে পড়িয়া থাকে।

বৈকালে বাবার মন্দিরে গান হয়।

আমার চোখেব অস্থ হইয়াছিল, ডাক্তারগণ বলিলেন আবোগা হইবেন। সেই সময় আমি তারকনাথে ধন্য দিয়াছিলাম, বাবার রূপায় আমি বেশীদিন কষ্ট পাঠি নাই। একদিনেই ঔষধ পাইয়াছিলাম। সেই ঔষধে আমার চক্ষু আরোগ্য হয়। তাহারপর ডাক্তারগণ দেখিয়া আশ্চর্য হইলেন।

ধন্যদেব তারকনাথ ! তাঁর অপার মহিমা বর্ণনা করা হু:সাধ্য।

নবদ্বীপ ।

হাওড়া হইতে ই, আই, আর বারহারোয়া ব্যাণ্ডেল লুপ লাইন দিয়া ৬৬ মাইল দূরে নবদ্বীপ। শিয়ালদহ হইতে ই, বি, আর দিয়াও যাওয়া যায়।

নবদ্বীপ চৈতন্য দেবের লীলাভূমি। নবদ্বীপে মাঘমাসের ত্রীপকমীর দিন হইতে গান আরম্ভ হয়। সে সময় অনেক ভাল সংকীৰ্ত্তনের দল আসে। দিনরাত কীর্ত্তন হয়, সেই সময় নবদ্বীপে বড় আনন্দময় বোধ হয়। সেই সময় হইতে গুলটের মেলা, পূর্ণিমায় শেষ হয়।

সোনার গোরাক্স, নিত্যানন্দ, মহাপ্রভু, পঞ্চভক্তের বাড়ী অষ্টভৈরব বাড়ী, শচীমাতা, পোড়া মা, বুড় শিব, গুপ্ত বৃন্দাবন, পুরাতন হারিসভার অপূৰ্ণ রূপে যুগল মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। সে রূপ-মাধুরী দেখিয়া নয়ন ফরাইতে ইচ্ছা হয় না।

নবদ্বীপে অনেক মন্দির আছে, গঙ্গা আছে, অনেক দেখিবার জিনিষ আছে।

ত্রীবৃন্দাবনের মত এখানেও প্রায় সকল মন্দিরে ভেট দিতে হয়।

ললিতা সখীর আশ্রম গুলবড়, সেখানে অনেক লোক বাস করে।

নবদ্বীপে নামের মহিমা সৰ্ব্বক্ষণ প্রচারিত হইতেছে। হাপ্রভুর নামে যে জীব চৈতন্য লাভ করে, তাহা বেশ অশুভব হয়।

লীলাময়! কত রূপে যে সৰ্ব্বস্থানে কত লীলা পরিঘাহ, সঁ সব লীলাভূমিত আমার বর্ণনা করিবার শক্তি নাই। বর্ণনা

ইহা গচ্ছ ইহা তিষ্ঠ, অধিষ্ঠান স্থির শ্রেষ্ঠ,
 গ্রহণ্য গ্রহণ্য বলে আত্ম সমর্পিয়ে
 জাগো ওমা “কুণ্ডলিনী” জাগো এ হৃদয়ে
 ইড়া, পিঙ্গলা সুষুম্নায় গাঁথিয়ে মালা
 পরায়ে তোমারে, নাশি ত্রিতাপের জ্বালা।
 ধূপ দীপ তেজ তব্ধে, চন্দনে পৃথিবী তব্ধে,
 কুসুমের আকাশ তব্ধে মূল মন্ত্র লয়ে
 অমৃত নৈবেদ্য সুধা আচমন দিয়ে।
 রেবেছি বলির তরে রিপু ষড়জন
 কামনা বাসনা যত করে জ্বালাতন।
 জ্ঞানের অনল জ্বলে, দিও সবে হোমানলে,
 ধর্ম্মার্থ ধর্ম্ম যতে মনোময় দ্রব্ লয়ে,
 যজ্ঞ শেষ হয় যেন পূর্ণাহুতি দিয়ে।
 শিরসী সহস্র দলে বসায়ৈ যুগে-
 হংসী সহ হংস মাগো মিলন হইলে
 শুন ওগো মা বিমলা, দূর করি মনো মলা,
 যুগল রূপেতে হেরি যুগল নয়নে
 মিলে যাই যেন মাগো ও রাজা চরণে।
 পৃজিব সহস্র দলে ছত্র ধরি শিরে
 চরণেতে “মন অর্ঘ্য” দিব ভক্তি ভরে
 নিরন্তর আঁখি মোর, হেরিবে চরণ তোর,
 প্রেম ভক্তি অশ্রুজলে ধুইয়া চরণ
 যা কিছু দিয়েছ, পদে করিব অর্পণ।

এস এস যা “কিমলা” ডাকি যা কাছরে
 পূজা আরোজন কোরে, আহি বসে সকাছরে
 আঁধারে তিমির নাশি আসিবে জননী
 পোহাবে আমার তবে এ চুঃখ রজনী ।
 “জগন্নাথো স্তুতো ভৈরব, বিমলা স্তুতো ভৈরবী”
 এই মহা তীর্থ মাঝে হেরি মহা ছবি
 আনন্দেতে অঞ্জলি হারা, বহিছে মা অশ্রুধারা,
 অব্যক্ত অচিন্ত্য রূপ বর্ণনা না যায়
 ও চরণে লীন করি রাখ মা আশায় ॥

এখান হইতে দর্শন করিয়া নির্গত হইয়া সোপানাবলী
 অবহন করিয়া সম্মুখে মুক্তি মণ্ডপ, নরসিংহ মূর্তি দর্শন করিয়া
 ।।ছিগী কুণ্ডের—জল শির প্রক্ষেপণ করিয়া বিমলা মায়ের মন্দিরে
 বেশ করিতে হয় । এখানে মায়ের বরাত্তর করা প্রসঙ্গ চিন্ময়ী
 ষ্ট । সতীদেহ হইতে উৎপন্ন ৫১ পীঠের ইহা একটি পীঠ স্থান ।
 ধানে দেবীর নাভী,—দেবী বিমলা ।

“ জগন্নাথস্তু মহা ভৈরবঃ
 বিমলা যত্ন ভৈরবী ”

অনেকে বোধ হয় জানেন না যে জগন্নাথজীর ভোগ কালে
 দ্বিদের ভিতর হইতে মায়ের প্রতি নিবেদন হইলে মহাপ্রসাদ
 ইয়া তবে বাহিরে আসে । এদিকে ঠিক সেই সময়ে বিমলা
 য়ের মন্দিরে ভোগ আরতি হয় ।

জগন্নাথদেবের পূজা পদ্ধতি সমস্তই তাত্ত্বিক মতে হইয়া
 কে আর দেবীপক্ষের মহাঈশ্বর্য দিন নিশীথ সময়ে বিমলা মায়ের
 বাবিশ তাত্ত্বিক পূজা হইয়া থাকে । সে সময় যাত্রীদিগের
 প্রসাদপ্রাপ্তি হয় ।

শ্রীচৈতন্য দেবের মাহাত্ম্যে মহাপ্রসাদ সেবনে জ্ঞাতিভেদ উঠিয়া গিয়াছে। আহা! সর্বস্থানে সকল দেবদেবীর মন্দিরে প্রসাদ সেবার যদি এইরূপ নিয়ম হইত!

এখান হইতে নির্গত হইয়া দক্ষিণে একাদশীর মন্দির, বামে বাসুদেব, গোস্ট, যুগল মূর্তি, সরস্বতী, সত্যভামা প্রভৃতিব মন্দির দর্শন করিয়া লক্ষ্মীর মন্দিরে আসিতে হয়, এখানে দর্শন করিয়া সম্মুখে নাটা মন্দিরে বসিয়া নানাবিধ জপ ও ঈশ্ট চিন্তা করিতে হয়।

তাহার পর এখান হইতে উঠিয়া দক্ষিণকালাকা, সূর্য্য মন্দির, ডের দাবে চৈতন্য মহাপ্রভুর পাদপদ্ম দর্শন করিয়া প্রান্তনে দাঁড়াইয়া দেব মন্দিরের চড়ার অষ্টধাতু নিখিত চক্রমজ দর্শন করিতে হয়, ঐ চড়ার উপরে প্রতি একাদশী তিথিতে মহাদীপ দান অতীব মনোমুগ্ধকর।

এখান হইতে প্রথম উত্তর দরজা পার হইলেই, বামে “বকুষ্ঠ” দক্ষিণে “পাতালেশ্বর মহাদেব” আছেন। দ্বিতল গা, বৈকুণ্ঠে যাত্রীগকে সুকল দেওয়া হয়। উক্ত সুকল দান উপলক্ষে আটিকা বন্ধন বা আটিকা বন্দোবস্ত করা হয়। আটিকার অর্থ হাড়ী, একটি আঙ্গুরের ৬ মাসের ষোড়াকিকে প্রায় একপোয়া আটিকা বলে। এক বৎসরের অঙ্গ আটিকা, দুই বৎসরের পূর্ণ আটিকা বলে। পূর্বে একপোয়া আটিকার মূল্য ২৫ টাকা ছিল, আজকাল ৩৩ টাকা হইয়াছে।

সমস্ত তীর্থ কাগোর পর সুকল দানের সময় স্বীয় স্বীয় পাণ্ডা এষ্ট আটিকা দানের যাক্স করিয়া থাকেন। এবং যাত্রীগণ আপনার সাধামত দান করেন, বা ঐখানে বসিয়া অঙ্গীকার করিয়া

কেন। শ্রীকৃন্দাবনে ও বদ্রীনারায়ণেও এইরূপ শুকল দানের
প্রথা আছে।

পাতালেখর মহাদেব দর্শন করিয়া আনন্দ বাজারে যাইতে হয়,
এখানে অন্ন বাঞ্জন মহাপ্রসাদ বিক্রয় হইয়া থাকে। তাহারপর
রান মণ্ডপ দর্শন করিয়া পুনরায় দেউড়ীতে আসিয়া উপস্থিত
হইতে হয়, এখানে শুক মহাপ্রসাদ বিক্রয় হয় শুক মহাপ্রসাদ
প্রথা :—জগন্নাথ বল্লভ, মগজনাড়ু, খাড়া, পারিজাত, মালপুয়া,
পানাবিধ পিষ্টক, দাঁত ভাঙ্গা ইত্যাদি বিক্রয় হইয়া থাকে।
কান কোন যাত্রী এখানে হঠাৎ ঠাকুরের রান্না বাড়ী দেখিতে যায়।
রান্না বাড়ীর বিশেষত্ব এই যে বড় চুল্লীতে ৬৭ টা ফোকর আছে,
প্রত্যেক ফোকরে লম্বা লম্বা বড় বড় তাঁড়ি বসে এবং আনশ্যক হইলে
তাঁড়ির উপর তাঁড়ি বসে, এই প্রকার বিস্তর চুল্লী আছে, নতুনা সহস্র
হাস্র যানীগণের ও মঠবাসী ভক্তবৃন্দের পম্পাপ্য পরিমাণে প্রসাদ
সবার সংস্থানের উপাযাস্থ্য নাই, রংযাত্রা হইতে পুনরায় পম্পাস্থ্য
শ্রীশ্রীশ্রী বাড়ীতে এইরূপ ব্যবস্থা বন্দোবস্ত আছে, ও হয়।

এ তীর্থে কোথায় ক্রীকপ ভোগাদি দিতে হয় ইহা সম্পূর্ণ
যাত্রীগণের মানস ও ক্ষমতা সাপেক্ষ। যাহার যেখানে ইচ্ছা
ভোগাদি দিয়া থাকেন। তবে সকল মন্দিরে একটি করিয়া দীপ
ও প্রণামী দিয়া থাকেন। জগন্নাথের মন্দিরের উপরে বা পদতলে
দীপ দান করা হয়। বিরাট মন্দিরের বিরাট পূজার এই ব্যবস্থা।

এক সময়ে এ স্থানে আসার অতি দুর্গম পথ ছিল বটে, কিন্তু
এত কষ্টে ভক্তিতাব বেশী উদয় হইত। এখন বাপ্পীয় শকটে
পুরী হইতে ৫ মাইল দূরস্থিত ঝালতী পাঠপুর হইতে যখন

শ্রীমন্দিরের চূড়া দেখা যায় তখন মনে কতকটা ভক্তিতে গদগদ
ভাবের উদয় হয়।

প্রার্থনা।

পতিত জনেরে করিয়ে উদ্ধার,
পতিত পাবন নামটা তোমার।
তাই শুনে নাথ এসেছি ছুটিয়া,
সব শোক তাপ যাইবে মুছিয়া।
মুরতি তোমার নয়নাভিরাম,
নয়ন পথগামী হও অবিরাম।
আর্হা কি সুন্দর মন মুগ্ধকর,
নিমোহিত প্রাণ হতেছে আমার।
আনন্দ ধামেতে ত্রিমূর্তি রূপেতে,
বসি দয়াময় ও রক্ত বেকীতে।
বিরাজিছ নাথ প্রেমের মুরতি,
প্রেম পরকাশি জগতের পতি !
ভেদাভেদ জ্ঞান করি তিরোধান,
জগন্নাথ রূপে হলে অধিষ্ঠান।
পাপী, তাপী, সবে আসিতেছে ছুটে,
ভ্রমরার মত পড়িবে হে লুটে।
চরণ কমলে মধু করি পান
জুড়াইবে আছা তৃপ্ত পরাণ।
বিশাল রূপেতে আবিহ কুণ্ডলার,
হাও হে তোমার চরণে শিখারে।

কণ্ঠেয়, নবেল্লু সরোবর, শ্বেত গঙ্গা, সর্গদ্বার অথবা চক্রতীর্থ, মোক্ষ, এই পাঁচটাকে পঞ্চতীর্থ বলে। চক্রতীর্থটা পুষ্করিণী নহে রের সহিত একটি ছোট নদীর সঙ্গমস্থল।

পঞ্চশিব—মাকণ্ঠেয়, কপালমোচন, যদেম্বর, নীলকণ্ঠেশ্বর, ৭ প্রায় দেড় মাইল দূরে লোকনাথ।

পুর্বমোক্ষের অনেক সাধুদের মঠ আছে যথা পুর্বের বা সিন্ধু-স্থিত বয়ান মঠ, দক্ষিণ পার্শ্ব মঠ, উত্তর পার্শ্ব মঠ, শঙ্করাচার্যের বিজয় কন্য গোদামীন মঠ, পাণ্ডল হরনাথের মঠ মুল্লুকদাস বরদাস, নন্দ নানকের মঠ ইত্যাদি।

প্রথম জগন্নাথ দর্শন কবিত্তে যাটবার সময় প্রসাদ খাইয়া ন করিতে যাইতে হয়।

জগন্নাথ দেবের বাহান ভোগ হয়। ভোগের পর সেই প্রসাদ আনন্দ বাজারে বিক্রয়ার্থ যায়। অনেকে মন্দির হইতে নিয়া লয়। আমাদের মন্দির হইতে কিনিয়া লওয়া হইত। জ্বাভীর ভোগ ও মঠ ভোগ, রাজবাড়ীতে ও মঠালিতে হয় যার।

বিভরের বাড়ী ও ঘাসীর বাড়ী আছে।

জগন্নাথে সকল বর্ণাশ্রমের মিলন হইয়া থাকে স্থাপন আছে এখানে জাতিভেদ নাই, সকলেই আনন্দময়কে লইয়া নন্দ ভোগ করিতেছে।

পুণীতীর্থে সমুদ্রের সোচ্চা সন্দর্শন করিলে চিত্ত বিশুদ্ধিত হয়।

সমস্ত ছাদিয়া আর কোথাও দাঁড়াই উচিত নয়। মনে হয়.

জগন্নাথ বুঝি সসীম ও অসীমের মিলন স্থল এই খানেই বিশাল
বিরাট রূপে প্রকটীত রহিয়াছেন।

অসীম সমুদ্রের কূলে এই বিরাট বিশ্বরূপ মূর্তি দর্শনে মন
আগ্ৰহারা হইয়া অসীম সমুদ্রেই লীন হয়।

সমুদ্রের উদ্ভিমালা সকল ছুটিয়া আসিয়া যেন বিশ্বময় জগন্নাথের
চরণে লুটাইয়া চরণ ধোত করিতেছে।

বাস্তবিক শ্রুতিতে পাওয়া যায় যে দ্বাব কবি তাঁহার
একটা চরণ পূরণ উপলক্ষে সমুদ্রের জলে ভগবৎ করিয়াছিলেন,
বলিতে গেলে সাগরের অনন্তত্ব বা অসীমত্ব তাঁহ রই অনন্তত্ব ও
অসীমত্ব প্রকটিত করিতেছে।

কি নিধি মিলিল।

অসীম সমুদ্রে আজি কি নিধি মি ।

প্রাণ আকুল কোরে, মন হারাষ্টে

অন্তবে বাহিরে তোমা কতযে খুঁজিছি,

কতবার কতরূপে তোমাতে দেখিছি।

আজি একি বিশ্বরূপ নয়নে ভাসিছে।

দেহ ছাড়ি প্রাণে যেন “প্রাণায়ামে” মিশেছে।

অনন্ত জলধি তুমি অনন্তে মিশিয়া।

অনন্ত বিশ্বের রূপ দিলে দেখাইয়া।

ভুবনেশ্বর ।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব দর্শন করিয়া, সাক্ষী গোপাল ও ভুবনেশ্বর দর্শন । ভুবনেশ্বরে জগন্নাথের মত সমস্তই, ভোগ রান্না বাড়ী, গুণ্ডিচা বাড়ী । যাত্রীরা সকলে প্রসাদ পায় । বড় বড় ধর্ম্মশালা আছে, ধর্ম্মশালার ভিতরেই পুষ্করিণী, বাগান । শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা পূজার দিন ভুবনেশ্বরে রথ টানা হয় । সে সময় ভুবনেশ্বরে খুব মেলা হয়, অনেক যাত্রী আসে ।

গুণ্ডিচা বাড়ীর নিকট শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আশ্রম আছে । ভুবনেশ্বরে হাওয়া পরিবর্তনের জন্য অনেক লোক আসেন ।

ভুবনেশ্বর হইতে গরুর গাড়িতে করিয়া উদয়গিরি, ঋগুগিরি, দর্শন করিতে যাঁতে হয় ।

উদয়গিরি পাহাড়ে সূর্য্যোদয়ের উদয়ের সময় দেখিতে অতি সুন্দর । উদয় গিরিতে অনেক গুলি গুহা আছে, সেখানে সম্রাসীদের সাধনার স্থান । জয়া বিজয়া, রাণী, গনেশ, স্বর্গ মর্ত্ত হস্তী, সর্প, ব্যাঘ্র, হরিদাস, জগন্নাথ এই কয়টা গুহা ।

উদয় গিরির পাশে ঋগু গিরি সেখানেও অনেক গুলি গুহা আছে । অনন্ত, দেবসভা, পরেশনাথের মন্দির, আকাশ গঙ্গা, দুর্গা, মহাবীর, নব মূনি ও ধ্যান গুহা ।

উদয়গিরি, ঋগুগিরি দর্শন করিয়া সেই দিনই ভুবনেশ্বরে ফিরিয়া আসিলাম ।

বৈষ্ণনাথ ।

বৈষ্ণনাথে ঘাইবার সময় জসীডীতে গাড়ী বদল করিতে হয় ।
ভার্গবী হুইতেই পাণ্ডারা যাত্রীগণকে লইবার জন্ত আসে । পাণ্ডা-
রা গাতে অনেক যানী থাকে । আর ধনুশালাও আছে ।

কন্দনাশা নদীর ধারে বৈষ্ণনাথ ধাম বৃহৎ মন্দিরের ভিতর
বৈষ্ণনাথের মূর্তি আছেন ।

মাঘ দ্বাদশ মাসে অনেক দেশ দেশান্তর হইতে সহস্র সহস্র
লোক গজাজল লব্ধ আসে বৈষ্ণনাথের মাথায় দিবার জন্ম ।
বৈষ্ণনাথ শিবের মাথায় গজাজল দেওয়া বিশেষ পুণ্যকার্য্য ।

মন্দিরের মধ্যে অনেক দেব দেবীর মন্দির আছে ।

মন্দিরের উত্তরে শিবগঙ্গা নামে একট বড় সরোবর আছে ।
সেই সরোবরে পাথর বাঁধান ঘাট ও মন্দির আছে, যানীরা এই
সরোবরে স্নান করিয়া থাকেন ।

বৈষ্ণনাথ শিবের কোনরূপ ভাগের বন্দোবস্ত নাই, শুনিয়াও
মন্দির চিড় ভোগ হয় ।

যাত্রীরা যাহারা যেরূপ মানসিক করে তাহারা সেইরূপ পূজা
দিয়া থাকেন ।

বৈষ্ণনাথে অনেক নর নারী ব্যাধি হইতে মুক্তি পাইবার
জন্য ধর্ম্ম দিয়া থাকেন ।

নন্দন পাহাড় ও ছোট ছোট অনেক পাহাড় আছে,
বৈষ্ণনাথের কিছু দূরে তপোবন আছে ।

বৈষ্ণনাথে অনেক লোক হাওয়া পরিবর্তন করিতে যায় ।

বিক্ষাচল ।

শ্রীশ্রীগুরুদেবের আদেশে আমার তীর্থ ভ্রমণ । আমি জানিতাম শ্রীশ্রীগুরুদেব যখন বুঝিয়া লইয়া গাইবান সেই সময় তাঁর রূপায় তীর্থ দর্শন হইবে । সেই জন্য আমি কখনও চেষ্টা করি নাই । সেই শ্রীমুখের বাণী সময়েই পূর্ণ হইবে ।

যখন তীর্থ দর্শনের সময় হইবে, সেই সময় শ্রীশ্রীগুরু রূপায় সমস্ত যোগাযোগ হইবে ।

আমার ঠানদিদি (বাবার মাসীমা) কাকাবাবু, পিসিমা প্রভৃতি তীর্থ ভ্রমণে যাত্রা করিয়া প্রথমে গয়ায় আসিলেন । তাঁহারা গয়ার কাসা শেষ করিয়া অন্যান্য তীর্থে যাত্রা করেন ।

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম স্মরণ করিয়া আমিও গানের সঙ্গে তীর্থ দর্শনে যাত্রা করিলাম । মনে করিলাম এ প্রহরই প্রেরণ ।

আমরা সন্ধ্যা ৬টার ট্রেনে রওনা হইয়া বোম্বাই টার্মিনাস সময় গতাকালে বিক্ষাচলে পৌঁছিলাম । আমরা গজাস্ত্রান করিয়া, বিক্ষাগিরির একাংশে পাহাড়ের উপর বিন্দুবাঙ্গি দেবীর প্রাচীন মন্দির আছে, ভগবতী এখানকার প্রদানাদেবী, যখন চণ্ড ও যুগের সতি ও কালী ও কৌশিকীর যুদ্ধ হয়, সেই সময় চামুণ্ডা নামে এই দেবী আবির্ভূত হন । অষ্টভুজা দেবী আছেন । বিক্ষোম্বর মহাদেবের মন্দিরের কাছে হুম্মানের মূর্তি আছে সেইখানে পাণ্ডারা যাত্রীদের সকল দেয় ।

আমরা দর্শনাদি করিয়া সেইদিনই ১১টার ট্রেনে এলাহাবাদ যাত্রা করিলাম ।

এলাহাবাদ বা প্রয়াগ।

আমরা এলাহাবাদে আসিয়া আমাদের এক আত্মীয়
বাড়ীতে থাকিলাম।

পরদিন সকালে সকলে কেল্লার ভিতর গিয়া সমস্ত দেবদেবী
অক্ষয়বট দেখিয়া নৌকা করিয়া সঙ্গমে স্নান করিলাম। এতখানে
গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর মিলন হইয়া ত্রিবেণী হইয়াছে। সোমনাথ
আলোপী দেবী দেখিয়া ঝুঁশিতে গেলাম, ঝুঁশির পাহাড় বড় মনোহর
নিচ্ছন্ন স্থান। এই স্থানে অনেক সাধু-সন্ন্যাসীরা থাকেন
ইহা তপস্তার স্থান।

দারাগঞ্জে বেণীমাধব, ব্রহ্মেশ্বর, শূলটকেশ্বর প্রভৃতি স্নান
করা হইল।

এলাহাবাদে কুস্তুর মেলাতে খুব লোকের ভীড় হয়, অনেক
নাগা সন্ন্যাসীরা আসেন। কুস্ত যোগের সময় আগে নাগা
সন্ন্যাসীদের, সাধুদের স্নান হইলে তাহারা পরে অন্য লোকের
স্নান করিবেন। কুস্ত যোগের স্নানের সময় নাগা সন্ন্যাসীরা
সকলে হাতী, খোড়া, উট, পাকী করিয়া আর কত নাগারা
পদ ব্রজে আসেন। সে সময়ের দৃশ্য বড়ই মনোরম। সাধু দর্শনের
জন্য সে সময় রাস্তার ভয়ানক ভীড় হয়। যমুনার এপারে
ওপারে এত লোকের ভীড় হয় কিছুমাত্র স্থান থাকেনা। একস্থানে
এত ভীড় সাধুসঙ্গ বড়ই আনন্দকর।

সেবাসমিতি হইতে অনেক ভলেন্টিয়ার যাত্রীদের অনেক
সাহায্য করেন। যদি কোন লোক ভীড়ে হারাইয়া যায়,

লেক্টিয়ারগণ সেবাসমিতিতে রাধিয়া, তাহার আশ্রয়গণের মুসকান করিয়া তাহাদের নিকট পৌঁছাইয়া দেয়।

এলাহাবাদের সমস্ত দেখিয়া আমরা আজমীড় যাবা করিলাম।

আজমীড়।

আজমীড়ে নামিয়া পুস্করে যাইতে হয়। আজমীড় হঠাৎ পুস্কক ৭ মাইল রাস্তা, খোড়ার গাড়ী টাঙ্গা করিয়া পুস্কর যাইতে হয়।

আজমীড় স্টেশনে নামিয়া আমরা খাজা সাহেবের কবর দেখিয়া, পুস্কর যাত্রা করিলাম।

খাজা সাহেবের কবর সমস্ত হিন্দু মুসলমান সকলকে দর্শন করিতে হয়।

পুস্কর।

পুস্করে বাগান খাট, খাটের চারিদিকে বড় বড় বাড়ী আছে। আমরা খাটের ধারে একটি বড় বাড়ী লইয়াছিলাম।

পুস্করে—গৌঘাট, ব্রহ্মঘাট, কপালমোচনঘাট, যজ্ঞঘাট, দর্বাঙ্গী-ঘাট, রামঘাট, কোটীতীর্থঘাট আছে, অনেক খাটের ধারে কতগুলি দেবদেবীর মন্দির আছে—ব্রহ্মার মন্দিরে স্কা মূর্তি আছে। ইহাব বাম পার্শ্বে গায়ত্রীর মূর্তি ও দক্ষিণ পার্শ্বে সাবিত্রীর মূর্তি আছে। ইহার চারিদিকে সনকাদি চারিভ্রাতার মূর্তি আছে। একটি ছোট মন্দিরে নারদের মূর্তি আছে। অন্য আর একটি ছোট মন্দিরে ইন্দ্র ও কুবের মহারাজের মূর্তি আছে। বজ্রীনারায়ণের, বরাহজীর ইত্যাদি অনেক মন্দির আছে।

পাহাড়ের উপরে সাবিত্রী দেবী অধিষ্ঠিত। পাহাড়ের ৩৬০টা সিঁড়ি আছে। ডুলি পাওয়া যায়, মাহারা পদত্বজে উঠিতে না পারেন, মাহারা ডুলি করিয়া থাকেন। আমরা ছয় খানা ডুলি করিয়াছিলাম, ডুলি ভাড়া ১ টাকা করিয়া লাগে।

পুসরে লোহা, সিঁড়র বিক্রয় হয়। সাবিত্রীর কপালে সিঁড়র ও হাতে লোহা দিতে হয়। আর সেই প্রসাদী লোহা ও সিঁড়র আনিয়া আত্মগণকে দিতে হয়।

আমরা মাত্র দিন পুসরে ছিলাম। পুসর স্থানটা বড়ই নিচ্ছন্ন ও শান্তিময়।

পুসরগাঁতে অনেক কচ্ছপ আছে। কচ্ছপগুলি তীরে উঠিয়া খেলা করে। তাহাদের কোন ভয় নাই, কাবণ এখানে জীব হিংসা নিষেধ।

স্নানের সময় সাবধানে পুসরগাঁতে স্নান করিতে হয়। কারণ জলজন্তুর বিশেষ ভয় আছে।

কুরুক্ষেত্র ।

কুরুক্ষেত্রে আমরা সকলে আসিয়া পৌঁছিলাম। শ্রীশালায় থাকিয়া সকলে দৈপ্যারণ হৃদে স্নান করিয়া কুম্ভী যে মহাদেবকে সহস্র স্তব টাঙ্গা দিয়া পূজা করিয়াছিলেন, সেই কুম্ভীশ্বর দর্শন ও পূজা করিয়া, অভিমুগ্ধ, কর্ণ, দ্রোণ, প্রভৃতির মৃত্যুস্থান ও পঞ্চ পাণ্ডবের মূর্তি, বানেশ্বর মহাদেব ভদ্রকালী, ভীষ্মের শরশয্যা, অর্জুনের বানগঙ্গা, সরস্বতী ইত্যাদি দর্শন করিলাম।

এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণদেব সখা অর্জুনকে শ্রীগীতার উপদেশ দিয়াছিলেন। সেইজন্য এই পূণ্যভূমি সকলের দর্শন করা উচিত।

সূর্যগ্রহণে এইখানে স্নান করায় বিশেষ ফাফাফা আছে ।

সেইদিন রাত্রেই আমরা কুরুক্ষেত্র হইতে জয়পুর যাত্রা করিলাম ।

জয়পুর ।

আমরা সকলে জয়পুরে পৌঁছিলাম । এখানকার রাজার গোবিন্দজীউ, গোপীনাথ, গোকুলনাথ, রাধা দামোদর, রামচন্দ্র, বিশ্বেশ্বর শিব প্রভৃতি দেব মন্দির দর্শন করিয়া, তৎকালপর জয়পুর চিড়িয়াখানা, মিউজিয়ম দেখিয়া পরদিন সকলে মপুরা যাত্রা করিলাম ।

মথুরা ।

মপুরায় আমরা পাঁচ দিন থাকিয়া বিশ্রাম ঘাট, শোভাঘাট, যোগাঘাট, প্রয়াগঘাট, দাঘাট, ইত্যাদি স্থানে স্নান ও দর্শনাদি করিলাম ।

গোপীনাথজীউর মন্দির, মপুরানাথের মন্দির, লউজীর মন্দির, মদনমোহন মন্দির, বিজয় গোবিন্দের মন্দির, দীদারঙ্গ মন্দির বাগকৃষ্ণের মন্দির আরও অনেক মন্দির আছে । কংসের লনাগার আছে । মপুরায় অনেক দেখিবার জিনিষ আছে ।

শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি মথুরা, চন্দ্রাবনে কত লীলা করিয়াছিলেন । সেই লীলাভূমির স্মৃতি চির এখনও বিজ্ঞমান রহিয়াছে ।

বিশ্রামঘাটের আরতি দেখিতে বড়ই সুন্দর যতক্ষণ আরতি হয়, নয়ন কিরাইতে ইচ্ছা হয় না ।

বিশ্রামঘাটের নিকট একটী স্তম্ভ আছে, তাহাকে সতী স্তম্ভ বলে। নীকসঃ কংস বধ করিয়াছিলেন, সেই সময় রাণীরা এইস্থানে চিত্তারোহণ করিয়াছিলেন।

মথুরায় সমস্ত স্থান ভ্রমণ করিয়া আমরা মথুরা হইতে ঘোড়ার গাড়ীতে করিয়া বৃন্দাবনে আসিলাম।

বৃন্দাবন।

বৃন্দাবনে অনেক দেখিবার জিনিস আছে। আমরা যে দিন বৃন্দাবনে আসিলাম, সেইদিন পাণ্ডা বলিল “বৃন্দাবনে ছয় স্থানে ভেট দিতে হয়। গোবিন্দজী, গোপীনাথ, বন্ধুবিহারী, যমুনা বন্দা, গুরুপাট এই ছয় স্থানে ভেট। প্রত্যেক স্থানে ৫ টাকা করিয়া ভেট দিতে হয়।”

৫ টাকা করিয়া ভেট করিয়া আমি বলিলাম আমার বোধ হয় গোবিন্দজীর মন্দিরে গিয়া দর্শন হইবেনা। কারণ আমার মত লোক ৫০ টাকা ভেট দিয়া দের দর্শন করা অসাধ্য। পাণ্ডা বলিল ইহার কমে হইবেনা।

তখন মনে হইল দয়াময় তোমার একি লীলা! অর্থ না দিলে তোমার মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিব না? যাদের অর্থ আছে তাহারা তোমার মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দর্শন পূজা করিবে? আর যারা ভিক্ষারিণী তাদের তোমার মন্দির প্রবেশের অধিকার নাই? হে দয়াময়! তুমি যে কাঙ্গালেব ঠাকুর, তুমি দয়া করিয়া আমার

সদয় মন্দিরে আসিয়া দেখা দাও । এখানে অর্থের পরিবার্ত্ত শ্রদ্ধা-
ভক্তি চাই । হে দেব ! তুমি দয়া করিয়া এষ্ট কাঙ্ক্ষালিনীকে
শ্রদ্ধা-ভক্তি দাও । দয়াময় তুমি না দিলে আমি কোথায় পান ।

পরদিন সকালে সকলে দর্শন করিতে যাইবেন, আমাকেও
যাইতে বলিলেন ।

মিনি আমাকে তীর্থ ভ্রমণ আনিয়াছেন এ মত প্রাপ্ত হইলে
আমার তীর্থ ভ্রমণ সেই ককণাময় পুষ্করাসের পাশ পক্ষ স্মরণ
করিয়া আমিও তীর্থভ্রমণ সঙ্গ হইলাম ।

প্রথমেই গোবিন্দজীব মন্দিরে যাওয়া হইল । ঠাকুরের অপার
মহিমা এমন যে মন্দিরের দ্বার অসংখ্য হোলা । কেহউ মন্দিরে
যাইতে নিষেধ করিল না, বা ভট্টের নাম উল্লেখ করিল না ।
পূজারীরা কত যত্ন করিয়া মন্দিরের মধ্যে লইয়া গিয়া দর্শন
করাইলেন ।

ঠাকুরের অপার কবনা দেখিয়া আমার আনন্দে অত্যাশ্রয়
বহিতে লাগিল ।

যত তুমি দয়াময় যত তোমার কৃপা, সত্যই তুমি কাঙ্ক্ষার
ঠাকুর । কাঙ্ক্ষালিনীকে কতবার কতরকমে পরীক্ষা করিয়াছ ।
আজ তোমার হৃদি সন্তুষ্ট হইল । দয়াময় তোমার ভক্ত কত দাস-
দাসী তোমার চরণ সেনার অধিকারী হইবে । কিন্তু আমি
সে ভক্তি টুক সংগ্রহ করিনি বলে বড় ভয়ে ভয়ে তোমার মন্দিরের
দ্বারে এসেছি । যদি মন্দিরে প্রবেশ করিতে না পারি, তাহলে
মন্দিরের বাহিরে বসিয়া তোমার সেই ভুবন ভুলান প্রাণ মাতান,

প্রেমময় মূর্তি সহস্রদলে প্রণবের মধ্যে দয়া করিয়া দেখা
দিও, প্রভু !

তুমি যে দয়া করিয়া নিত্যানন্দ রূপে আমার অন্তরের সব
নিরানন্দ দব করিয়াছ, সেই ভরবায় আজ আমার এই প্রার্থনা ।

প্রার্থনা ।

বৃন্দাবন শন, রাধিকারমন,

এস এস বংশীধারী,

যংল কপেতে এস জদয়েতে,

হেরি আমি আঁখি ভরি ।

মুরতি তোমার, অঙ্গিত আমার,

রেখেছ জদয় পটে,

সে ছবি তৈরিয়ে, আপনা ভুলি ব,

চরণে পড়ি লুট ।

শনি বংশীধারি, হযে পালনী,

সাবা বস স্বর্জি আমি

কোথা নীলমণি, ডাকে কাজালিনী

এসতে অন্তরামা ।

সেকপ মোহন, অন্তরে লুকান,

কেন তব মরি যুরে,

এ জদয়ে বাস, কর শ্রীনিবাস,

সব ভুল যবে তরে ।

যখন গোবিন্দজী দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসি, তখন কেহ ভেটের কথা বলিল না। বন্ধুবিরারীর মন্দিরে আসিলাম, তখন ভেট চাহিল। আমবা জিজ্ঞাসা করিলাম কত ভেট দিতে হয়। একটা ব্রাহ্মণ বলিলেন লাল যাবীর ১০ পাঁচসিকা আর কাকাল যাবীর ১০ আনা। আমি ১০ আনা করিয়া ছয় স্থানে ভেট দিলাম।

গুরুপাটে শাক্তদের কালী মূর্তি আছে। আর দেবীদের গৌরীমূর্তি আছে।

শেঠজীর মন্দিরে প্রত্যহ দুইবেলা রাধাশ্যাম পূজন হয়, ফাল্গুনদেব পয়সা, চাল, ডাল, আটা, দেওয়া হয়। সোণার শালগাছ আছে।

শ্রীকৃন্দাবনে অনেক দেব মন্দির আছে গোবিন্দজীর, গোপীনাথ দিনমোহন, রাধাবমন রাধাবিনোদ, রাধানামাদর শ্যামসুন্দর, গোকুলানন্দ, পৌষমাসী, সাজাজীর, লালাজীর, বন্ধুচারীর, গোপেশ্বর হোদেবের মন্দির আছে।

ব্রহ্মকৃষ্ণ, যোগেশ্বর, অক্ষরতীর্থ, চন্দ্রশখাট, গুলশাট, বিহারশাট, শিববগখাট, শ্যামবগখাট।

মিকুঞ্জবনে রাধাকৃষ্ণের নিত্য বিহারের স্থান নিম্নবনে শিখা রাজা সাজিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দারী করিয়াছিলেন। এই স্থানে তমাল বৃক্ষের গায়ে শ্রীকৃষ্ণ যশোদার ভয়ে মাতনের হাত দিয়াছিলেন। পাণ্ডারা সেই দাগ এখনও যাবীদের দেখান।

কুঞ্জবন, বেলবন, তমালবন, কন্দাবনে চৌষটি বন আছে। ফলনের সময় ভিন্ন চৌষটি বন ভ্রমণ হয় না।

বংশীবটে, রূপার বংশী আছে, সেই বংশী যাত্রীরা কিনে
শ্রীকৃষ্ণকে দিয়া থাকেন।

কদমতলা, কালীয় - দমন। আর কিছুদূরে রাধাবৎস
গিরিগোবর্দন আছে।

ছোট বালকেরা গান কবে শুনিতে বড় ভাল লাগে।

বাধাকুণ্ডে, শ্যামকুণ্ড, গিরিগোবর্দন,

মধুর মধুর বংশী বাজে এইত বৃন্দাবন।

আর করিতে, পার করিতে, নিব আনা আনা,

শ্রীমতীরে পার করিতে নিব কানে সোনা।

স্থানে স্থানে ছোট ছোট বালকদের লইয়া কৃষ্ণলীলা করে
টুক মালায় মণি নীচুরী ইত্যাদি দেখিতে খুব সুন্দর।

গোবিন্দে নন্দরাজার বাড়ী। যশোদার আঁতুড় ঘর, বংশী
শোনা প্রতি আছে।

বৃন্দাবনের যে কত লীলা তাহা সব বর্ণনা করা যায় না।

অযোধ্যা ।

আগরা, দিল্লী, লক্ষ্মী হইয়া অযোধ্যায় আসিলাম। অযোধ্যায়
সরযু নদীতে স্নান করিয়া রামঘাট, লক্ষ্মনঘাট, রামকোট, বামচন্দ্রের
জন্মস্থান, অশ্বমেধ যজ্ঞভূমি ইত্যাদি দেখিবার যোগ্য স্থান ও
অতি রমণীয় স্থান।

মণিপর্বত, কুবেরের পর্বত, সুগ্রীব পর্বত, হনুমান গুড়ী
ইত্যাদি আছে।

স্টেশন হইতে অগোখা সহর আড়াই মাইল দূরে।

ভী পাওয়া যায়।

পরদিন সকালে অগোখা হইতে ৬ কাশীধাম যাত্রা করিলাম।

কাশীধাম।

কাশীতে যে দিন আসিলাম। সেই দিন দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করিয়া বিশ্বনাথের গলিতে যাইতে পথে শনিদেব, চণ্ডী, গণেশ দর্শন হইল। তাহারপর বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা, স্কানবালা পূজিত দর্শন পূজা করিয়া, সন্ধ্যার সময় দেবীর ন্যায় দর্শন করিয়া আরতি দেখিয়া তারপর বিশ্বনাথের আরতি দেখা হইল।

পরদিন মণিকর্ণিকায় স্নান করিয়া শঙ্কট, শঙ্ক, মেঘন, তুঙ্গাবাড়ী, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম দেখিলাম।

রামনগরে রাজার বাড়ী ও রাজার তুঙ্গ বাড়ী, সোনার তুঙ্গা মূর্তি আছে। মন্দিরটি খুব সুন্দর।

তারপর পরদিন ৫শী হইতে একলা পনাম পক্ষ গঙ্গায় স্নান হইল।

বাস কাশী দেখিয়া, সারনাথে যাওয়া হইল, সারনাথে বুদ্ধদেবের বহুদিনের পুরাতন জিনিষ। মাটা খুঁড়িয়া বাহির করিয়া সেই সমস্ত জিনিষ একটি বাড়ীতে মিউজীমের মত রাখা হইয়াছে। বুদ্ধদেবের মূর্তি আছে। আর সারনাথ মঠাদেব আছে।

বেণীমাথব ও বেণীমাথবের দ্বন্দ্ব দেখিলাম। দ্বন্দ্বের উপর উঠিলে কাশী সহর সমস্ত দেখা যায়। বেণীমাথবে তৈলঙ্গ স্বামী মূর্তি আছে। আনন্দবাগে ৬ ভাস্করানন্দস্বামীর মার্বেল পাথরের সমাদি

মন্দির আছে। বাল্যকালে কবার এই আনন্দ বাগে গিয়াছিলাম,
তখন শ্রীমানন্দ স্বামী ছিল সে সময় এই আনন্দ বাগ কত
আনন্দময় ছিল। এখন সেই শ্রীমানন্দ বাগ নিবানন্দময় হইয়াছে।

শিবময় কাশী। ত্রিলোচনেশ্বর, পুষ্পদণ্ডেশ্বর, শূলটঙ্কেশ্বর,
শিবের কাছাকাছি বাড়ী, কালভৈরব ইত্যাদি অসংখ্য মন্দির আছে।
একদিন সকল শিবের মাথায় জল দেওয়া হয়।

বিদ্যালাক্ষী, কামাখ্যাদেবী, চৌষটি ঘোঁষা মন্দির, শীতলা
মাতার মন্দির আছে।

কাশীতে এক বৎসর থাকিলেও সমস্ত দেবদেবীর মন্দির দর্শন
শেষ হইবেনা।

অগস্ত্যের সময় অন্নপূর্ণার মন্দির দেখিতে বড়ই সুন্দর
সেই সময় সোনার অন্নপূর্ণা মূর্তি দর্শন হয়। অন্নপূর্ণার মন্দির
অন্নবাহুনে পবিত্র হয়। পর্বত পরিমানে সমস্ত শ্রদ্ধা মিস্ত্রী
সাক্ষান হয়।

পাঁচাদেশের আনা দিলে অন্নপূর্ণার আসল মূর্তি দর্শন করান।
শ্রীক সন্তোষ প্রাণ ভড়াইবর স্থান দক্ষিণ। প্রত্যহ স্থানে
স্থানে ভাগৱৎ, দেবী ভাগৱৎ, কাশীখণ্ড পাঠ হইতেছে। ভোর
৪টার সময় হইতে জয় বরনাথ ক্ষণিতে কাশীবাসীগণকে আগ্রিত
করিতেছে।

গঙ্গার ধারে আসিলে প্রাণে কত শান্তি পাওয়া যায়। সম্ভাব
দীপমালায় দেখা কত শোভাময়ী হ'ল।

অসংখ্য নব-নারী মোক্ষলাভ করিবায় আশায় বিধবাধ,
অন্নপূর্ণার চরণ তলে পড়িয়া কত শান্তি উপভোগ করিতেছেন।

মা অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার সর্বদাষ্ট পরিপূর্ণ আছে। কালীর
দোকান বাজার দেখিলে মনে হয় সত্যি মা অন্নপূর্ণা সোনার কাণী
রচনা করিয়াছেন।

অন্নপূর্ণা রূপে আসি সাজালে সোনার কাণী
এসেছেন বিশ্বনাথ ভিখারীর বেশে,
ওমা মন্দিরে তোমার, তুমি কিরাওনা আর,
লীলাময়ী কত লীলা, ছাড়িয়ে কৈলাসে।
রচিলে মা, কালীশয় পুরাত্তে সবার কাম,
সজিয়াছ মাগো, কাণী আনন্দ ভবন।
কত নর-নারী আসি, ভোগাচ্ছে ওদ কাণী,
নোঞ্চ অভিলাষে ওদ লাজে শরণ।
পূজি দুঃল মূর্ত্তি, গঙ্গা শাস্তি মূর্ত্তি মৃত্তি,
অন্তে মণিকণিকাতে ল'ভবে শিখাম
ধন্য ম'গে ধন্য কাণী, ধন্য ভ'ন কাণাবাসী,
চরণ দিগে মেরে পুবাও মনস্কাম।

গয়াক্ষেত্র ।

বিষ্ণুপাদ মন্দির ।

ভক্ত গয়াক্ষেত্রের দুই সন্দেশ, ভগবান গয়াক্ষেত্রে বর চাতিতে
লিলেন। গয়াক্ষেত্র মাটোরে প্রণাম করিয়া বর চাতিলেন “ভগবান
য স্থানে আমার মৃত্যু হইবে সেই স্থানেই যেন আমি শিলা হইয়া
পাছি। হে ভক্তবৎসল, সেই শিলায় উপর যেন তোমার শ্রীচরণ

স্থাপিত হয়। আর যে পর্য্যন্ত চন্দ্র, সূর্য্য ও তানকা মণ্ডল বিচ্ছিন্ন থাকিলে সেই পর্য্যন্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর আমার এই শিলা শরীরে অধিষ্ঠান করুন। আর যে কেহ এই স্থানে পিণ্ডদান ও তর্পণ করিলে, তাহার পিতৃ পুরুষগণ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গে বাস করিবে। যে দিন ইহার বিপরীত হইবে সেই দিন এই ক্ষেত্রের শিলার নাশ হইবে। প্রভো! এই ক্ষেত্রের নাম গঙ্গা-ক্ষেত্র হইবে।

“তদাত্ম বলিয়া ভগবান বিষ্ণু নিজের পাদ-পদ্ম গঙ্গাস্রবের মস্তকে স্থাপন করিলেন, দেখিতে দেখিতে স্রবের শরীর শিলাতে পরিণত হইল।

সেই সময় সমস্ত গ্রীষ্ম ও সমস্ত দেব দেবী ৫১ পাঠ ও উপপাঠ প্রাক্ষেপে আবিস্কৃত হইলেন।

বিষ্ণু মন্দিরের প্রবেশের পথে দক্ষিণ দিকে উপপীঠের দেবী গণেশ্বরী অধিষ্ঠিতা হইলেন।

বিষ্ণু ভগবানের মন্দির রানী অহল্যাবাই ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে নিৰ্ম্মান করাইয়াছিলেন। মন্দিরের কারুকাম্য দেখিবাব উপস্থিত একপ পাথরের এত বড় মন্দির কোথাও নাই। এই মন্দিরের নাট্য মন্দির খুব প্রশস্ত ও বিচিত্র। অগ্রে শ্রীবিষ্ণুর চরণ চিহ্নটা সুরক্ষিত করিয়া তাহার পদ মন্দির নিৰ্ম্মান করা হইয়াছে।

এই মন্দির কল্ল ও মধুশ্রবা নদার ধারে অবস্থিত।

পূর্বদিকের সদর দরজার সম্মুখে শ্রীহুম্মানজীর বিশাল মূর্ত্তি আছে।

গদাধরের মন্দিরের সম্মুখে নদীর উপর শঙ্করাজ্যের মূর্তন
হ নির্মাণ হইয়াছে।

গয়ালীরা এখানকার পাণ্ডা। এখানে অনেক বাঙ্গালী
রোহিত আছেন। হিন্দুস্তানী ও মহারাষ্ট্রীয় আচাযাও আছেন।

পিতৃপক্ষের ১৫ দিন খুব যাবীব ভীড় হয়। সকল ত্রীর্ণ
দীবই (খাপ্পেল ককন আর নাই ককন) আগে প্রেত শিলায়
পুণ্ডান বিধি আছে। অপঘাত বা আত্মহতায় যাহাদের মৃত্যু
হইয়াছে, তাহাদের প্রেত শিলায় পিণ্ডান না দিলে বিয়ু পাদ-পল্ল
পুণ্ডান দেওয়া হইবেনা। পূর্বের যাবীব ৪৫ দিন ধরিয়া
খাপ্পেল করিতেন আবার কাহাবাও বা ১৫ দিনে সারিতেন।
মৃত আজ কাল যাবীব এক দিন কিম্বা তিন দিনে গয়ার জাক
য করেন। তাহাদের “খাপ্পেল” করা হয় না।

বিয়ু মন্দিরের সম্মুখে কল্ল নদীর পরপারে সীতাকুণ্ড ও
মগিরি আছে। এখানে সীতাদেবী দশরথকে বালীর পিণ্ডান
দিয়াছিলেন। দশরথের হাত আছে। আর সীতা দেবীর
হস্ত আছে। কল্ল, তুলসী, বট বৃক্ষকে সাক্ষী করিয়া পিণ্ডান
দিয়াছিলেন। কল্ল মিথ্যা বলিয়াছিলেন, সেইজন্য সীতা
অন্তঃসলিলা হও” বলিয়া অভিশাপ দিয়াছিলেন। বট বৃক্ষ সত্য
লিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহাকে “অক্ষয় হও” বব দিয়াছিলেন।

বিয়ু মন্দিরের উত্তর পশ্চিমে সূর্যাকুণ্ড নামে একটা বড়
ফরীণী আছে। ইহার দক্ষিণ দিকে দক্ষিণ মানস, মধ্যে কনকল
৭৯ উত্তর ভাগে উকচী কুণ্ডের সম্মুখে সূর্যাদেবের মন্দির

সূর্য্যদেবের চতুর্ভুজ মূর্তি আছে। এই স্থানে চৈত্র ও কার্তিক মাসে
শুভ। অষ্টমীর দিন ও ষটপঞ্চমী ত্রতে শুব মেলা হয়।

বিষ্ণু মন্দিরের এবং ব্রহ্মাযোনির মাঝামাঝি স্থানে অক্ষয়নাথ
বিরাজমান। ইহার নিকটেই কঙ্গিণী কুণ্ড। এইস্থানে শেখ
পিণ্ডদান করিতে হয় এবং এই স্থানেই পাণ্ডারা যাঁহীদের স্তবক
দিয়া থাকেন, ইহার নিকটে বৃদ্ধ প্রপিতা মহেশ্বরের মন্দির আছে।

অক্ষয় নটের কিছু পূর্ব্বে আদি মায়া মঙ্গলা গৌরীর মন্দির
প্রায় ১১২টা সিঁড়ি পাহাডের উপর দেবী (৫১ পীটের) পীঠস্থান।

এখানে দেবীর স্তন পড়িয়াছিল সেইজগা দেবী মঙ্গলা গৌরী
কিছু নিকটে মহাদেব মার্কণ্ডদেবের মন্দির আছে। তুর্গা পূজার
তিন দিন মঙ্গলা গৌরীতে পূজা, বলি, চণ্ডিপাঠ হয়। মঙ্গল
গৌরীর পাশে জনান্দনের মন্দির আছে। পাহাডের নীচে বিষ্ণু
নরেন্দ্র বঙ্গ সরোবর আছে।

কঙ্ক নদীর পর পাহাডের শঙ্কটা দেবীর মন্দির আছে। আর সেই
খানে প্রপিতা মহেশ্বর মহাদেব আছে।

গয়াক্ষেত্র পর্বত মালায় সুশোভিত। সেইজগা এখানে
অনেক সাধক সাধনায় সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ব্রহ্মাযোনি
পাহাডের ২২২ টা সিঁড়ি আছে। পাহাডের উপর ব্রহ্মা আছেন।

ব্রহ্মাযোনি নিকটেই কপিল দ্বারা সেখানে লেংটা বাবার
আশ্রম ও সমাধি মন্দির আছে। আশ্রমটী অতীব মনোরম
শান্তিময় স্থান। এই স্থানে আসিলে আর গৃহে কিরিতে ইচ্ছা
হয় না। এখানে গম্ভীরনাথ, লেংটা বাবা, কৃষ্ণানন্দ স্বামী আরও
অনেক সন্ন্যাসীর সাধনাব স্থান।

আকাশগঙ্গা পাছাডের উপর বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর
“ক্ষার স্থান। কুলদানন্দ স্বামী এই স্থানে সাধনা করিয়াছেন।

রামলীলা, দুঃখহারিণী দেবীর স্থান হইতে ১ মাইল দূরে ৩৫৭টি
দাঁড়ী আছে। রাম লক্ষ্মণের মন্দির ও পাতালেশ্বর শিব আছেন।
একটেই বাগেশ্বরী দেবীর মন্দির আছে।

গোরক্ষীর সভার গোশালীর নিকট গোরক্ষী বাবাব আশ্রম
সমাধি মন্দির আছে।

প্রতাপলা পাছাড রামলীলা হইতে ৬ মাইল দূরে।
হাডের নীচে ব্রতকৃষ্ণ নামে একটি পুষ্করিণী আছে, এই স্থানে
ন ও তপন করিয়া পিণ্ডদান করিতে হয়। প্রেত শিলায়
ওদান করিলে মৃত প্রেতঘোনি হইতে উদ্ধার হইয়া যায়।
ধানকার পাণ্ডাকে “স্বামী” বলে। পাছাডে উঠিতে ৪০০ সিঁড়ি
হে। এখানে একটি ছোট ধনুশাল আছে।

বৃদ্ধগয়ায় বুদ্ধদেবের মন্দির আছে মন্দিরটি দেখিবার জিনিষ,
ধীমূলে বুদ্ধদেবের সমাধি আসন আছে। এই স্থানে বুদ্ধদেব
ধি লাভ কবিয়াছিলেন। মন্দিরের ভিতর প্রস্তরের উপর
নার পাত ঘোড়া বুদ্ধদেবের বিশাল মূর্তি আছে। কত দেশ-
গান্তর হইতে কত লোক এই মন্দির দর্শন করিতে আসেন।
গয়া স্থানটী বড়ই নির্জন ও মনোরম। বুদ্ধদেবের মন্দিরের
ষ্ট পঞ্চ পাণ্ডবের ও জগন্নাথের মন্দির আছে।

বৃদ্ধগয়ায় মহেশ্বরীর বাড়ী, বাগান ইত্যাদি আছে।

সাঁহারা ঝাপ্পেরল করেন, তাঁহারা বৃদ্ধ গয়ায় পিণ্ডদান করেন।

দয়্যতে অনেক দেব দেবীর মন্দির আছে । ভাটত শাহর
মাতার ও ভাটার সম্মুখে পিতা মহেশ্বরের মন্দির আছে ।

বরুণ পাতাডের উপর আদি গদাধরের মন্দির আছে
কামাখা দেবী পড়িছে আছে ন ।

সমুদ্রের পানীতে এল থাকেনা । বসাকালে খুব জল হয়
দীপকাল বরুণেরে খুঁজিয়া যায় । দালক রাশি মকড়ের
চায় । বরুণেরে খুঁজিবে । বরুণ বালি খুঁড়িলেই জন পাওয়া যায় ।

স্তব ।

জয় জয় গদগদ ককণা সাগর,
কপায় কপাকর দাসীরে তোমার ।
ভবে প্রমি ক্রান্ত হয়ে নিরাশ অন্তরে,
চরণ লভিল বলে এসেছি তুষারবে ।
বদিতা তবনা এই আশা আছে মনে
ক'জালিণী বলে যাবে ফিরাল সকল জনে ।
কাজ লেন সব ভূমি তাবে ফিরাবেনা জানি
ম পড়েছি ভিক্ষা গ্রহ চরণ তুখানি ।
চরণ পরশে তব, খাইবে খুঁজিয়া
মনের 'ম'লন পদ' দাওকে মুছিয়া ।
কবল আলোক দাও পথ দেখাইয়া
অন্দের মত যে শুধু রয়েছে বসিয়া ।
তাই সন্ধ্যাতরে নাথ ডাকিছে তোমারে
তামি পিনে মোর কেহ নাহি এ সংসারে ।

অনিষ্টা সংসারে নাথ, চাহি নিতা ধন
 নতুবা জীবনে মম নাহি প্রয়োজন ।
 তোমার চরণ তলে লভিতে আশ্রয়
 আছি আমি আশা কোরে ওহে দয়াময় ।
 ভরে কাঁড়েরী হয়ে সব পদাবধার
 কোরে দিও পাদ ওহে দাসীরে, তোমার ।

—০৩০—

পশুপতিনাথ ।

পশুপতি নাথে যাইবার সময় বী, এন, ডব্লিউ রেল দিয়া
 রকসেলি হইয়া যাইতে হয় । পূনের রকসেলি হইতে পদবজে
 যাইতে হইত । এখন বীরগঞ্জ হইতে একখান ছোট রেল
 হইয়াছে তাহা ভীক্ষাগড়ি পয্যন্ত যায় । ভীক্ষাগড়ি হইতে কাশি,
 মটর ও পদবজে যাইতে হয় । মটরে প্রাণক লোকের ৮ টাকা
 করিয়া ভীমভেরী পয্যন্ত ভাড়া । আর কাশি ভীক্ষাগড়ি হইতে
 একেবারে পশুপতি নাথ পয্যন্ত ৫ টাকা ভাড়া । মটরে যাইতে
 বড়ই কষ্ট চড়াই ও ভরসাই রাখা খুব থাকে লাগে । সেইজন্য
 কাশিতে কিম্বা পদবজে যাওয়া ই ভাল ।

বীরগঞ্জ হইতে “পাস্পোটি” লইতে হয় । শিব গাঁয়ের
 সময় পশুপতি নাথের মেলা হয় । এই সময় সাণীদের যাইবার
 সময় । অগ্ন সময় সাণীরা যায় না ।

ভীক্ষাগড়ি পয্যন্ত আমরা রেল গিয়াছিলুম তাহারপর আমাব
 সঙ্গীরা পদবজে যাইবেন বলিলেন । কিন্তু সে সময় আমরা শরীর
 অসুস্থ থাকায় আমি পদবজে যাইতে সাহস করিলাম না, একখানা

মটর ঠিক করা হইল, তাহাতে ৫৬ জন ছিলাম। প্রত্যেকে ৮ টাকা করিয়া ভাড়া দিয়া ভীমভেরী পর্য্যন্ত যাওয়া হইল। পশুপতি নাথের ডাক্তার বাবু ঐ মটরে ছিলেন। রাত্রি ৯ টার সময় আমরা ভীমভেরীর হাসপাতালে পৌঁছিলাম। সে রাতে আমাদের হাসপাতালেই থাকা হইল।

ডাক্তার বাবু ছিলেন বাঙ্গালী আমাকে খুব যত্ন করিয়াছিলেন। পরদিন সকালে ৬ টাকাত্তে একটি কাণ্ডি ঠিক করা হইল সে একেবারে পশুপতিনাথ পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবে। ডাক্তার বাবু বলিলেন এ সময় পশুপতিনাথে যাত্রীর খুব ভীড়, যদি আপনি সুবিধা মত ঘর না পান, তাহা হইলে আমার বাসার ঠিকানা দিলাম, আপনি আমার বাসায় গিয়া থাকিবেন, আপনার কোন কষ্ট হইবে না।

দুইদিন কাণ্ডিতে যাইয়া তিন দিনের দিন সকালে পশুপতি নাথে পৌঁছিলাম। মন্দিরের পাশে একটি ভাল বাড়ী ঠিক করিয়া বাবাকে একবার দর্শন করিয়া আসিলাম। তাহারপর আমার সঙ্গিরা আসিয়া পৌঁছিলেন।

নেপাল রাজ্যের মধ্যে পশুপতিনাথ নেপাল রাজার ঠাকুর।

পশুপতিনাথের মন্দিরের নিকট যাত্রীদের থাকিবার জন্য অনেক ধর্মশালা আছে। কিছু দূরে গুহেশ্বরী দেবীর মন্দির আছে, আরও অনেক দেব মন্দির আছে।

পশুপতিনাথে পাণ্ডা নাই। রাজার পূজারী ব্রাহ্মণ আছে। সেটুকু পাণ্ডার পীড়ন নাই, পশুপতিনাথের পাথরের পঞ্চমুখী

যুক্তি মন্দিরের মধ্যে আছেন। চারিদিকে লোহার গরাদ দেওয়া আছে। সম্মুখে দালান আছে, সেই দালানে দাঁড়াইয়া দর্শন করিতে হয়। আর পূজার দ্রব্য ও টাকা পূজারীর হাতে দিতে হয়। তিনিই পশুপত্তিনাথকে পূজা করেন। পশুপত্তিনাথকে স্পর্শ করিতে দেয় না।

মন্দিরের নিকটে ছোট ছোট পাহাড়ের উপর সন্ন্যাসীদের না কবার জগা রাজা ঘর করিয়া দিয়াছেন।

পশুপত্তিনাথে অনেক গাঙ্গুলী ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর ইত্যাদি বাস করেন।

বিশ্রাতিবে দিন আমার পশুপত্তিনাথের মন্দিরে গিয়া জপ ও পূজা করিলাম, চার গজের পশুপত্তিনাথের পূজা হইল, পূজার শেষ হইল আমার দর্শন করিলাম। সেদিন সন্ধ্যা হইয়া, বাজা, ভজা হইতে লাগিল। সন্ধ্যার ২টার দিকে হইতে হইয়া পূজা, দান ওয়াস। পূজার কাল শেষ হইল।

পশুপত্তিনাথে হাইওয়ে প্রিন্সিপালের পর চটি চুইয়ে পাহাড় সেখানে দর্শন ও পূজা করিতে হয়। হাইওয়ে পর ভৈরবেরা, ভাই-ভেরীতে হাসপাতাল আছে, অনেক দোকান ও জায়গা, অনেক লোকের বাস আছে।

চৈত্র, বৈশাখ, কাশী পানস্কাউ, বালকান, চৈত্রমেন চন্দ্র দিল্লি, লীলাগড়ী, হানকোট হইতে চটি পাহাড় হইল।

শ্রীমদ্ভক্তি ভৈরবের পদ স্তব্ধ হইল।

বদ্দিনারায়ণ ।

শুকদেবের রূপায় বদ্দিনারায়ণ যাইবার সংসঙ্গিনী মিলিল কালীঘাট হইতে ১০ জন স্ত্রীলোক আসিয়া বিষ্ণু-পাদ-পদ্মে পিণ্ডদান করিলে যাইতেছেন। তাহাদের সকলের গৈরীক বসন পর দেখিলে আমাদ মনে হইল তাহারা বদ্দিনারায়ণের সান্নিধ্য। আমাদের প'ড়াতেই তাহাদের বাসা হইয়াছিল।

বেলা ৫ টার সময় আমি সেই বাসায় গিয়া তাহাদের সহিত দেখা করিয়া আমাকে তাহাদের সঙ্গে লইবার জন্য বলিলাম। আমাকে সঙ্গে লইবার জন্য তাহারা খুব আনন্দের সহিত আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

তাহারা বলিলেন আজ রা ৭.৯ টার সময় স্টেশনে গিয়া থাকিব, ভোর ৬ টার ট্রেনে চ'বদাব যাইব।

এত অল্প সময়ের মধ্যে আমার যাইবার সমস্ত আয়োজন করিয়া লইতে হইল। আমি বাড়ীতে আসিয়া কাপড়, কল, 'মধুর', মাঝু, ইসাবুদন ইত্যাদি চিক করিয়া লইলাম।

অনেকে বলিল "অচেনা অজানা প'রের সঙ্গে কেমন কোবে যাবে এই চুগম পড়ে"।

কিন্তু শুকদেবের রূপায় আমাদ মনে হয় এ জগতে পর .কহট নয়। একমাত্র শুক ব'দ তিন জগতের সর্বদাই বিরাজিত আছেন, সমস্ত জীবের মধ্যে তিনিই প্রকাশিত আছেন তবে আমার পর .ক ৭ — বাস্তবিক ফল তাহাদের সঙ্গে গিয়াছিলাম, তাহারা চিক গভধারিণী জননী মত, সহোদরা ভগিনীর মত কত আদর যত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন তাহা চোখে আপন আর কে হইবে?

এই বৈশাখ শুক্ল-পাদ-পক্ষ স্মরণ করিয়া বসিবারামও সাতা করিলাম।

আমরা ১১ জন স্রীলোক আর একটি বালক ছড়িদার।

কাশী হইতে আরও দুইটি স্রীলোক আমাদের গাড়ীতে উঠিলেন। তাঁহারাও আমাদের সঙ্গেই ছইলেন, তাহাদের সঙ্গে অগ্রা সব লোক ছিল, তাহারা তাহাদের সঙ্গে গেলেন না।

মদ্যগঞ্জ হইতে একটি স্রীলোক কণা ও পুত্রদ লইয়া আমাদের গাড়ীতে উঠিলেন, তাঁরা লক্ষ্মীতে নামিবেন। মনিরাম মদ্যগঞ্জে জাগত শিব আছেন, তাহার পূজা দিতে গিয়াছিলেন।

সেই স্রীলোকটি আমাকে বলিলেন “ভাট আপনারা বদিনারায়ণে যাইতেছেন, আমি এই পাঁচটি পয়সা দিলাম, বাবার পূজা দিয়া বাবাকে জ্ঞানাইবেন, বাবা যেন আমাকে নিয়ে যান।

৬ই বৈশাখ আমরা বেলা ১০ টার সময় করিম্বারে পৌঁছিলাম।

মন্ডলালায় থাকিবাব বাবস্থা করিয়া আমরা ব্রজকুণ্ডে স্থান করিয়া গঙ্গার ধারে যে সমস্ত দেব দেবীর মন্দির আছে তাঁহা সমস্ত দর্শন করিলাম। গাঁতাবা পিণ্ডদান করিবেন তাঁহার কুশাবধি ঘাটে পিণ্ডদান করিলেন। গঙ্গা এখানে প্রায় একমাইল চওড়া, গোমুনী হইতে দুই লাখায় বিভক্ত হইয়া পুনরায় কনখলেব নৌচের দিকে মিশিয়া এক স্রোত হইয়াছে।

করিম্বারে করিম্পেডী, কুশাবধি, বিশ্বকেশ্বর, নৌলপনত, কনখল (মন্ডলায়) এই পাঁচটিকে প্রধান তীর্থ বলে।

করিম্বাবের প্রধান দাটেল নাম করিম্পেডী এখানে বিষ্ণুর চরণ ছিহু দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা ধর্মশালার আসিয়া রক্ষন করি । হারাদি করি
বাজারে গেলাম, সেখান হইতে জুতা, মোচাঠি, ছুঁচ, সূত,
বিন্দি, ইত্যাদি কিনিয়া সন্ধ্যার সময় গঙ্গার ওদিক
দেখিয়া সকলে বাসায় ফিরিলাম ।

আমাদের সঙ্গে এক মা ও তাঁর মেয়ে দুই জনে ছিলেন
সেই রাত্রে মেয়েটির খুব জ্বর হইল ।

পরদিন সকালে আমরা স্নান পূজা শেষ করিয়া, বাসে করিয়
কনকল ও বিষ্ণুকেশব মহাদেব দেখিতে গেলাম । বিষ্ণুকেশবে একটি
মন্দির তিওর বিষ্ণুকেশব শিবলিঙ্গ, দুর্গাদেবী, গনেশের মূর্তি আছে
অন্যদিকে পাহাড়ের নীচে গৌরীকৃষ্ণ নামে একটা কুণ্ড আছে ।

নীল পর্বত একটা ছোট পাহাড়, ইহার নিম্নে গঙ্গার স্রোত
ধারা চলিয়াছে, সেই ধারাটিকে নীলধারা বলে । সেই নীল ধারা
দেখিয়া মন বিমোহিত হয় । এই স্থানেই নীলেশ্বর মহাদেব
আছেন ।

বহলে দক্ষেশ্বর শিবের মন্দির আছে । এই মন্দির
শিবমন্দির শিবের দেহত্যাগ করিয়া চলেন ।

আমরা বাসায় আসিয়া দেখিলাম মেয়েটির জ্বর খুব বড়িয়াছে
ভুল নিকটেছে, দেখে আমাদের বড় ভয় হল । আমরা ধর্মশালার
মহাশয়দেরকে বলিলুম যে একজন ভাল ডাক্তার আনিবার জন্য ।

মানেকারটি জন ভাল ওৎফলং ডাক্তার আনিবেন
ডাক্তার ২ ঘোষিতান দিয়া দেহের নিকট ১০৬ ডিগ্রী ফার্নাইট
পর্যন্ত দিতে হবে । আমি তিন ত্রিশ পাণ্ডাইয়া দিব দুই মন্দির
অন্তর ৩২৪ পাণ্ডাইবেন তাহাতে জ্বর কমিবে ।

ডেইটার নামকে কলিমা ১১ ১২
 টিগ্রাম পত্রিকা মাং যেন অসম্য লক্ষ্য যাই। ১৩
 রবিশার টেলিগ্রাম করিতে ১৪ ঢাকা লাগিল।

দেবতাবাদ কাঙ্গিয়া বলিলেন, "আজ প্রোফার ২ ইংল্যান্ড।
 ১. বেলিজিয়ায় কি প্রকার আসে দেখা হইবে। ২. মাদ্রাস
 ৩. আসিয়ার মধ্যে কোথায় জাহাজ থাকবে, ৪. কোথায়
 ৫. থাকবে

[illegible]

না হইলে তোমার দর্শন পাওয়া যায় না। দয়াময় তুমি দূর
দূর করিয়া দেখা দাও, সেই তোমার চরণ দর্শন করিতে প
মানুষের ইচ্ছা ও চেষ্টায় কিছুই হয় না।”

২ ও ৩ নং টিকে পূজার দ্রব্যগুলি এনেছিলেন, সেই সম
দ্রব্যগুলি ও কিছু টাকা আমাদের দিয়ে বলিলেন “তোমরা
পূজা দিও”।

আমরা প্রত্যেকের নিকট হইতে বিদায় লইয়া বিবর ম
অধিকেষ্ট যাত্রা করিলাম। কেবলই মনে হইতে লাগিল দূর
যতক্ষণ না তোমার চরণ দর্শন পাই; ততক্ষণ দর্শনের আশা নই

অধিকেষ্ট ।

সন্ধ্যার আগে আমরা অধিকেষ্টে আসিয়া পৌছিলাম
পাঞ্জাবীর মন্ডালীয়ায় আমাদের বাসিনা ব্যবস্থা করা হইল।

সন্ধ্যার সময় আমরা অধিকেষ্টে, ১০ জিউ বামসীতার মন্দির
দর্শন করিয়া, গঙ্গার ধারে আসিয়া গিয়ালাম। গঙ্গার
পানী তরঙ্গ বহিতেছে।

বড় বড় মাছ সব তীরে আসিয়া খেলা করিতেছে। ও
তীরে শুনে মাছ বের পাবে না। সেই জগা মাছ গুলি
কিন্তু বলা করে। মাছের গায়ে হাত দিলে ভয় পায় না। মাছ
করিয়া জলে ফেলিয়া দিলে তা করিয়া বাইয়া ফলে।

অধিকেষ্টের গঙ্গার চকল তরঙ্গ নীড়া দেখিতে বড়ই সুন্দর
আমরা গঙ্গা তীরে বসিয়া সন্ধ্যা-রূপ শ্রবণ করিয়া আসিয়া
যাইলাম।

পনদিন ভোবে কাপড় কাচিয়া, পজা করিয়া সেইদিন হইতে
অত্যাশ্রিত জুতা মোজা পরিয়া পনবজ্জ বন্দন যথেষ্ট
করিত হইল।

এখানে নানা নান প্রকারের পন বস্ত্র হইত। পনবজ্জের
প্রায় ২০০ মাইল দূর এই নরন শু পনবজ্জ হইত।
কন্যা মনকে বেশ করিয়া বেঁধে নত হইত। 'জয় নন্দনাকী
জয়' বলিয়া বাঁহর হইতে শুত।

শ্রব

বিশাল বনরী দেব তুমি নাদ্রায়ণ
অগতির গতি নাথ বিপদ ভঞ্জন।
দেখা দিও এ বাসীরে এই আকারণ
কেমনে হেরিব তব শুভাঙ্গা চরণে ?
শুক উপদেশ লভি শ্রবর প্রসায়
২৬ চক্রে ভেদ বরি শুভে দয়াময়
সকল পদক্ষেপে নসি প্রাণ বপোনে
যোগজন হেরে সদা যোগ মগ্ন হিতে।
অস্তরে বাহিরে অকাঙ্ক্ষিত যোগীনা
বনরীক শ্যাম রূচি বদিক এ জন।
চুটিয়াছে নরনারী তব দরশনে
দেখা যেন পায় সনে শুভাঙ্গ চরণে ?
বিশাল বনরী জয় এত কথা বলে
প্রাণপণে নরনারী চুটেছে সকলে।

এই যোগ পথ ধরি নরনারী গণে
মিশ্র হয়ে দিও তব কমল চরণে
গৈরিক বসন পরি ন'নারী গণ
ঐক্যচারী কপে সব সেজেছে কেমন ।
সমান কামনা সব দিয়ে বিসর্জন
বাঁধনি • চিত্ত ক্ষুদ্র হেবিত্তে চরণ
অপার মত্ততা তব বর্ণন না যায়
১২ দিন কিবাহত আঁখি নয়ন ওড়ায় ।
সংজাইলে প্রাণভিরে অপূর্ব শোভায়
গাঁড়িয়ে সন্ততি মালা দিয়েছ তোমায় ।
নারী স্বৰূপ শোভে পবিত্র উদ্দেশে
শান্ত বাস্তব পটকের সামগ্রীর মধ্যে ।
কর অক্ষয় রক্তে সম্মিলিত করি তব
নে মধুর স্থিতি ঢাকেন সুউচর সাধারণ ।
গান • টাবরা দুই 'ক' অনোক্তন
হৃদয়ে যে উৎসাহ • ফি জীবন সংস্কার
অর্থ • চেষ্টা করি বঙ্গ • লোকের
স্বাধীনতা লাভের জন্য • লোক সংস্কার ।
বাঁধন ছিন্ন করে দেবে অবাঞ্ছিত
দুঃখ ভর • জ্ঞান • সকল
‘সত্য’ সিদ্ধি পাবে পরে হৃদয় ‘নিবৃত্তিতে’
ক'ব'ত্ব নিষ্ঠুর ব'রি শুধু কবিত্ব ।
মহা কবি মহাপুরুষ শুভে প্রসন্ন
দাস্তু গোমেদ • ২২ ‘সপ্তম’ অধ্যায়

সুবিকশের পরে যে চটী সেই চটী তইতে আমাদের মাল
 গুজন হইল। প্রত্যেক 'মল কাণ্ড' এক মণ বরিষ্য
 লভ্য। এক মণ মালে ৬৫ টাণা দিতে হইবে। আ
 ৬০ টাণা করিয়া "চাবনি" দিতে হইবে। মল কাণ্ড . . .
 চাবনি' বলে আর . . . দিন . . . হইবে. ড . . .
 . . . প্রায়, গুপ্তবাণী বিদ্যা নারায়ণ . . .
 . . . রায়ণ এই সা গোণে "ভাতি", "দামান", "ক . . .
 " . . . কাণ্ডের" বখশিস শু . . . দিতে হয় . . .
 হজন মালব দি শু ৪ জন ডা . . . দিল হে ৪২ ৩০ ৪
 ৩ ক বখশিস শু ১৬ মের . . . দিতে হইবে

৪২ বখশিস লভ্য . . .

সম্ভাব সমস্ত অমল মূল ভা . . .

ভোর বেলা কাপড় কাচিয়া পূজা করিয়া আসান সম . . .
 আরম্ভ করিতাম। আর প্রত্যহ সময়ে ৭৮ মাইল আর . . .

৪।৫ মাইল চলিতাম। ফুলবাড়ী চট্টার পর হইতে-

চট্টার নাম।	মাইলের সংখ্যা।
ঘটগাড্	২
নাই মোহন	৩ জলের খুব ধা।
বিজনী	৩ চড়াই।
কৃষ্ণ	৩।
বন্দব ভেল	৩ ওংরাই।
মহাদেব	৩।
সেমল	৩।
কাগ্গী	৩
বাস ৮টি	ওংরাই, হাসপাতাৎ ডাকঘর আছে।
চালতী	৭
টমরাশ	২।
দেবপ্রয়াগ	২।

এই সব চটি পার হইয়া আমরা ১২ট বৈশাখ ১০। ১১টের সময় দেবপ্রয়াগে পৌঁছিলাম। এই স্থানে ভাগিরথী অলক নদীর সঙ্গম স্থান। এখানে রত্ননাথ দেবের দর্শন ও পিণ্ড দান। প্রায় তুর্থাৎ দ্বিতীয়াংশে অনেক মস্তক মণ্ডন করেন। আমিও অন্য একজন সঙ্গমে স্নান করিয়া রামসীতা, গকড দেব দর্শন বরিলাম আর সকলে মস্তক মণ্ডন করিয়া স্নান পিণ্ড ভোজা দান, পুণ্ড দান করিলেন। এই সঙ্গম স্থলের দৃশ্য অতি মনোহর।

দেবপ্রয়াগে তারঘর, পোস্টাফিস, থানা ও অনেক দোকান আছে, সব জিনিষ পাওয়া যায়। দেবপ্রয়াগে বদী ও কেদার

নাথের পাণ্ডাদের বাড়ী ।

বলীনারায়ণের রাস্তা খুব খারাপ ও কঠিন অনেকের মধ্যে
মনিয়াছিলাম, পদব্রজে যাওয়া বড়ই কঠিন । সেইজন্য আমার
মনে বড় ভয় হয়েছিল, আমার মত দুর্বল লোক পদব্রজে যাইতে
পারবে না ।

কিন্তু বলীনারায়ণের রূপায় রাস্তায় চলিতে কোন কষ্ট হয়
নাই । বরং বোধ হয় কাণ্ডি, কাঁপান অপেক্ষা, পদব্রজে যাইতে
বড়ই আনন্দানুভব হয় ।

পর্বত মাথার অপূৰ্ণ শোভা । রাস্তার একদিকে পাহাড় আর
একদিকে অলকনন্দা ভাঙিরখী টীকণ গঙ্গা নদ করিয়া প্রসারিত
হইতেছেন । মনে হয় যেন পর্বত সমুদ্রের তরঙ্গের শব্দ তাহার
কোন স্থানে গঙ্গা নীরব ।

পর্বতের স্তনে স্তানে বরাবর জন পড়িতেছে দিপাসীক
পদিকদিক সেই জন পান করিয়া তৃষ্ণা নর করিতেছে । পর্বতের
পাহাড়ের মাঝে উঠান ভাবে প্রসারিত অলকনন্দা গঙ্গা নদ পুষ্প
শৈবাল সমূহের মনকত হয় অতীব মনোহর

পর্বতের উপর নানানকম দুলের গাছ লাল গুল, সাদা গুল,
গঙ্গা জলে বাড়িয়া কাশীর চিনি দিহা কাছলে আশাচাঁদ ও
আশাশায় ভাল হয় । এই পাহাড় পথে আমাশায় রোগ পায়
সকলের হয় ।

পর্বত পথে চলিবার সময় সব সামগ্র্য চলিতে হয়, কোন
একদিকে পাহাড় আর একদিকে গঙ্গা সহ দিকে পড়িবার হয় ।
এই একটা রাস্তা ভিন্ন আর রাস্তা নাই । সেইজন্য এই রাস্তা দিয়া

মাগুস, গক, ছাগল, ঘোড়া সবলকে বাইতে হয়। গক, ছাগল, ঘোড়া যখন বাসা দিয়া যায় সেই সময় একেবারে পাহাড় ঘেঁষে বাইতে হয়, তাহলে তাহা একপক্ষ দিয়া যায় যেতৎক্ষণাৎ পড়ি বাইতে হয়, পাহাড়ের ধারে থাকিলে সেই স্থানেই বসিয়া পড়িলে। আর গজার দিক দিয়া চলিলে থাক লাগিলে একেবারে সন্ধ্যা হইলে পড়বে তার আর কোন চান পাওয়া বাইবে না। সেই জন্যই সাধারণে পাহাড়ের দিক দিয়া বাইতে হয়।

কত সন্ধ্যা পাহাড়ের বসিয়া “দৌ কথা কও” “চোখ ফেল” বলিতেছে।

পাহাড়ের ধারে ধান, গম, , পোলাও শাক, বপি ইত্যাদি চাষ হয়।

আর স্থানে স্থানে বলাশতান আছে। কাঁচ কলা, বলাশতাক, মাচা কিনতে পাওয়া যায়।

রাশায় স্থানে স্থানে গরম দুধ, পোঁড়া, জলাপা বিক্রয় হয়।

পথে কাঁচ, ঘোড়া পাওয়া যায়। মাগুসের রাস্তার চান্দ পা ফুলিয়াছে ও বেদনা হইয়াছে। আবহাওয়াতে তাদের না কিছু অগা কোন কাঁচের শব্দ হইয়াছে। সেইজন্যে কাঁচ, ঘোড়া পথেই পাওয়া যায়। ইহাতে মাগুসের অনেক সুবিধা।

আমাদের সঙ্গে একজনের শ্রীনগরবে পথে ছর হইল। শ্রীনগর চৌকিতে কাঁচ করা হইল। একেবারে উত্তীর্ণ পাহাড়ের উপর।

পাহাড়ের কোণে রাশা, বাসা বেশ পরিষ্কার, সোজা, রাশা হইয়াছে।

পাহাড়ের উপর পাহাড়ীদের ছোট ছোট ঘর আছে।
পাহাড়ী মেয়েরা নাচে নামিয়া গঙ্গা হইতে জল নাইয়। উপরে
উঠেছে। জঙ্গল হইতে কাচ নষ্ট। পাহাড়ে উঠিলে
পাহাড়ী মেয়েদের শিল্প খুব 'সুন্দর ও বর্ণ বেশ সুন্দর

দাস্তা ও পুত্র নান। দেহিলে মনে হয় মহাদেশের সব বৈশ্যের
 ১২ নাই। মেয়েরা অধিবাসী মোত। মেয়েদের মুখে
 ফকিরি হাসিভরা। কলকাতার শুভনা, খাঁসার জাম মালম হ
 পড়ে থাকে। পুত্রযুগলি বৈশ্যের তাঁর হোদ

বালক বালিকাদের জাতি খণ্ডনা। বোম্বে ও মাদ্রাস।
 ২৩ ছোট বালক না নকাগুলি যাবেনদের সম্মুখে রাখিয়া নাড়
 দান করবে। বসে 'মাদ্রাস, মুক্ত হওয়া—নিষ্ক' ১২২৭

[illegible]

১৯৭১ সালের ১৫ আগস্ট রাতে
 ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে

[illegible]

८५२७६१८००

[illegible]

ଦାମଟା'ଣ ୧

१३५५ • ०

সিদ্ধান্তমতঃ

২০ জুন ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে

2.57

১৭ই বৈশাখ আমরা বিশ্বকৈদারে আসিয়া বিশ্বেশ্বর মহাদেব দর্শন করিয়া শ্রীনগরে আসিয়া কালী কমলীর স্বর্গশালায় থাকিলাম। সেখানে লক্ষ্মীনাথের মন্দির ও গঙ্গা আছে। শ্রীনগর হইতে এক মাইল দূরে বালী, মহাদেব, অন্নপূর্ণা, গণেশ, গবভদ্র ইত্যাদির দেবালয় সমূহ আছে।

শ্রীনগর বেশ বহর, এখানে পুলিশ, হাসপাতাল গার্ডার, পোস্টফিস আছে। অনেক দোকান আছে। সব জিনিষ প ওয়ায়।

শ্রীনগরের পর হইতে চটা।

চটার নাম।	মাইলের সংখ্যা।
সুবরতা	৫
চুইসেরা	২০
চাতিখাল	১
কাঁকড়া	২০০ গুংরাই।
নরকোটা	২০০ চুড়াই ৫০ গুংরাই।
গুলাংরা	২০
চুগা	২ এখানে একটি দোলা আছে
কদ্র প্রয়াগ	১ একটি পয়সা দিয়া চুলিতে হয়।

১৭ই বৈশাখ আমরা কদ্রপ্রয়াগে আসিলাম, কদ্রপ্রয়াগে অনেক নন্দা মন্দাকিনীর সঙ্গম হইয়াছে। আমরা সঙ্গমে স্নান করিয়া মহাকালী, কদ্রদেব, নারদেশ্বর শিব দর্শন করিয়া জলযোগ করি। ১৮ই দিনই কদ্রপ্রয়াগ হইতে যাব করিলাম।

কদ্রপ্রয়াগে পোস্টাফিস, হাসপাতাল আছে। দোকান আছে—সবজি নম পাওয়া যায়।

এখানে হই, ৩ টি পথ কর্ণপ্রয়াগে তার একটি পথ কদার নামে গিয়াছে।

আমরা প্রথমে কদারনাথ ঘাইবার সজ্জা করিলাম।

কদ্র প্রয়াগ হইতে ৮টা।

চট্টার নাম।	মাইলের সংখ্যা
ছত্রোণী	৫
ত্রিলোড	১
মঠ	১
রামপুর	১
গঙ্গাস্থান	১ পোস্টাফিস
ভিলা	৭
কুণ্ড	১
গুপ্তকানী	১০ কিলোমিটার

এখানে দেশী, আরও গঙ্গাস্থান অটল ২, গঙ্গাস্থান ৩, নিম্নান, তরপুনা, বাগী পাকল, সৌন্দর্যাব, পদমাধন, দস্তী, দোপদী আছে। মনিরগির কুণ্ড আছে দুই পায়ে দুইটা সিংহের গোমুদী আছে ওই ওই ৫০ পায়ে ৫০ পায়ে গোজল, আর একমুণ্ডে মুন'র জল।

অনেক দোকান আছে, তার অফিস ও পোস্টাফিস আছে।

সেদিন গুপ্তকানীতে থাকিয়া পরদিন ওখানে হইতে যাত্রা করিলাম।

মন্দিরের সম্মুখে একটা ধুনী দুলতেছে হিন্দিলাম উঠা
 চিরকাল প্রজলিত থাকে এই ধুনীও সকল যাতায়াতের কাজে দিতে
 হয়। আমরা সকলে কাঠ দিলাম।

মন্দিরের পাঁচিদে পাঁচটা কল আছে। সন্ধ্যা ৩টা, ৪টা এবং
 সবসময়ী কল, গোবী কল, দল্লী কল। পাঁচটা কলের গল মধ্যক
 দিতে হয়। অনেক দেবদেবী আছে।

বহুকালি ধ্যানের দে কল আছে। আমরা জনম
 করিয়া সেইদিনই বিদ্যামারায়ণ উঠতে যাবে করিলাম।

উত্তীর্ণ সময় সময় উঠতে, না'ম্যান সময় সময় ধুনী
 সেই সময় রুষ্টিও যুব হইল। পাঁচটা কল দাঁড়াইল স্থান নাই।

রাষ্ট্রায় বাল্যের কল কল দিতে। ওরে যোগে
 জাতি দিতেছে। তাহা উপর একটা হাত দল পলি। তাহা
 মধ্যে একটা জাতি এমন ভাবে দাঁড়িয়েছে, যে জাতি একত্রে
 দিতেছে। তাহাতে গম, যব ইত্যাদি পেরা হইতেছে।

বৃষ্টির সময় আমরা সেই ধরে গিয়া আশ্রয় লইলাম। বৃষ্টি
 বামিলে আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম।

সেদিন এমন হইল বৃষ্টি আর ধান না। রাষ্ট্র চলিতে চলিতে
 আবার বৃষ্টি আরম্ভ হইল। রাষ্ট্র দাঁড়াইবার স্থান নাই। শিজিয়া
 পাশ্চ চলিতে লাগিলাম। কাল পাঁচ উপরে সন্ধ্যার পর চল
 নিষেধ। যুব ভয়ের কারণ, অনেক রকম নিষাধ বিধি আছে তাহা
 কর্মজাইলে মানুষ বাঁচে না।

সন্ধ্যার একটা পূর্বে আমরা, গোবীকুলে পৌঁছিলাম।

গৌরীকৃষ্ণে ও গঙ্গাকৃষ্ণে গঙ্গা আছেন। লক্ষ্মীনারায়ণ গৌরী
শঙ্কর আছেন।

দেওয়ান রাস্তা আমবা গৌরীকৃষ্ণে থাকিয়া পরদিন সকালে
কেদারনাথ যাবার বিনাম।

কেদারনাথের রাস্তা খুব চড়াই ও বরফ শুনিয়া আমি ও
আর একজন ক'ণ্ডা ক'নিম। গৌরীকৃষ্ণ হইতে কেদারনাথ দর্শন
করিয়া, আবার গৌরীকৃষ্ণে পৌছাইয়া দিবে, ৫২ টাকা লইবে।

অসম্ভাব্য বরফ চতীর পর হইতে, এবার কেদারনাথের তুষাবার্ত্ত
যবলাগিরি দেখা যায়।

চিরবাসা ভৈরব হইতে চড়াই আরম্ভ, এইখানে দেউপদী দেখ
রক্ষা করিয়া ছিলেন। সেইজন্য এখানে চিরবাসা ভৈরব আছেন।
এখানে নুতন কাপড়ের চির দিতে হয়।

রামবাড়া হইতে খুব বরফের রাস্তা আর তেমনই চড়াই।
সেইজন্য সকলে রাস্তায় চলিতে চলিতে বলিতেছে “জয় নন্দন
কেদারনাথ ক জয়”।

ক'নিম কেদারনাথ ও বেশ করেছেন। বরফের রাস্তা পার
করিবার জন্য রামবাড়াতে ৮০ খানা ১২ টাকাতো অনেক কাণ্ডা
পাওয়া যায়। অনেক যাবী কাণ্ডা করিয়া বরফের রাস্তা পার
হইতেছে।

কেদারনাথের পাছাড় একেবারে বরফে মগ্নিত। বরফের
উপর দিয়া চলিতে বড় কষ্ট হয়। শুধু পায়ে চলিবার সময় পা
নিম কিম্ব করে—তাও পা সব অসাড় হয়ে যায়।

কেদারনাথের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া সকলেই তাঁকে সন্মান
করিতে পারে। বাবা কেদারনাথের কি অসীম দয়। পাপাণাং
সকলেই তাঁকে বুকের মধ্যে লইয়। সমস্ত পাপ, পাপ, ক্রোধ ও
সেবনা দূর করিতেছে। "সদা সত্যায় কেদারনাথ। অজানা জগতের
পতি বতসর। হোমার দশ হাল এতাদেশের জন্য ...
এ নূল প্রাণে কৃপা-বত পদবত অতিক্রম করে ...
কিয়া আসিতেছে, শুধু হোমার চরণ তল অশ্রু পাঠ্যের ...
দুঃখায়। কৃষ্ণ ওচরণে জ্ঞান দিল সব পাপ ত্যগ নিবারণ করিল।

স্তব ।

শাল। গিরির পদে, মন্দিরের বসন্তে

বিদ্য। জগৎ জালায়

কেদার কত ... লোকে ...

বি অপর দয় ...

কি বিত্ত ...

এব চরণে ...

জগৎ ...

পতিত ...

তুমি ...

দেহে ...

যে দিকে ...

দিক ...

আমরা দশন পূজা করিয়া, মন্দিরের পাদস্থিত বৃক্ষের তল,
প্রাচীন ও নিষিদ্ধ ডাল হাতে ...

করিয়া ৩ বার, তারপর গোমুখী হইয়া ৩ বার গড়ম্ব করিলাম।

২ নদের সম্মুখ কাছাকাছি নদ আছে যাবীদের থাকিব-
 ওয়া। একখানি ঘরে আমবা ছিলাম। ছুড়িদার কাঠ জালি
 আশ্রয় করিয়া দিল। আমাদের ১১ জনকে ১১ খানা কম্বল দিল
 দুইখানি করিয়া কম্বল লইয়া গিয়াছিলাম। কেদারনাথে ভয়ানক
 শীত। গরম জামা, সেমিজ, দুই তিন খানি কম্বল, ঘরে আশ্র-
 তবু নাতে কাঁপিতে হইতেছে।

আমরা পাণ্ডাকে বলিলাম “সন্স্কার সময় আমবা কেদারনাথে
 আরতি দেখিব।” পাণ্ডা বলিল “সন্স্কার সময় ঘর হইতে বাহিরে
 হইতে পারিবেন না। সন্স্কার একটু পূর্বের দেখিবেন, সমস্ত ৬৫
 মন্দির বরাংক ঢাকিয়া গিয়াছে।”

যাবারের শোকান ৬৫ খান আছে। বরফের উপর উলুন
 কাঁসিয়া যাবাব তৈয়ারী করিতেছে। মতি ময় কেদারনাথের দি
 অপূর্ব মহিম।

লুচি ও জিলাপী ১ টাকা করি সেব বিক্রয় হইতেছে।

সন্স্কার একটু পূর্বের দেখিলাম সত্য সত্যই কেদারনাথে
 মন্দির দুধারে আরত হইল পাণ্ডা তাড়াতাড়ি আমাদের ঘরের
 দরজা, জানালা বন্ধ করিয়া দিল।

কেদারনাথে একদিনের বেশী কেহ থাকে না আমবা পরদিন
 সকালে কেদারনাথের দর্শন পূজা করিয়া, কেদারনাথ হইতে যাত্রা
 করিয় বৈকালে গৌরীকুণ্ডে আসিয়া সেইদিন নালা চটীতে গিয়া
 রাত কাটাইলাম।

২৬শে বৈশাখ উদীমঠে গ্রামের নাম। উদীমঠে
কেন্দারনাথের গদি আছে। লক্ষ্মীনারায়ণ, দুর্গা, মহাদেব, পর-
শুরাম, গঙ্গা, যমুনা, প্রভৃতি অনেক দেবদেবীর মন্দির আছে।
একটা কুণ্ড আছে, সেই কুণ্ডের জল মাথায় দিতে হয়।

উদীমঠে অনেক দোকান আছে। হাসপাতাল, তার অফিস,
পোস্টাফিস ইত্যাদি আছে।

উদীমঠ হইতে চটা।

চটার নাম।	মাইলের সংখ্যা।
গণেশ চটা	৩১০
পোখীবাঁসা	৫
চোপ্তা	৩
পাঞ্জরবাঁসা	৪
মণ্ডল	৬
গোপেশ্বর	৭১০
চামলী	৩

২৭শে বৈশাখ আমরা সন্ধ্যার সময় চামলী আসিলাম।
চামলীতে অনেক দোকান তার অফিস, পোস্টাফিস, ক'ডারী,
হাসপাতাল আছে।

চামলী হইতে দুইটা রাস্তা একটা বদীনারায়ণে, আর একটা
কর্ণপ্রয়াগ হইয়া রামনগরে গিয়াছে।

পরদিন সকালে আমরা বদীনারায়ণের পথে যাত্রা করিলাম।

চামলী হইতে চটা।

চটার নাম	মাইলের সংখ্যা।
মঠ চটা	১১০

চটীর নাম	মাইলের সংখ্যা ।
ছিনকা	১১০
সিয়াসৈন	২
হাট্	১
চেবিনা	১

চেবিনা হইতে একটি পথ তুঙ্গনাথে গিয়াছে আর একটি পথ বদীনাথে গিয়াছে ।

ভড়িয়ার সমস্ত যাত্রীদের তুঙ্গনাথে যাইতে নিষেধ করিল । তুঙ্গনাথের রাস্তা বড়ই কঠিন চড়াই ও বরফপূর্ণ । ওখানে কেহই যায় না । আর তুঙ্গনাথে গেলে বদীনারাঘণে যাইতে বিলম্ব হইবে । সেইজন্য যাত্রীরা সকলে বদীনারাঘণের পথে চড়িয়া গেলেন ।

চেবিনার পথে আমাদের সঙ্গে তুঙ্গনাথের পাণ্ডার দেখা হইল ।

পাণ্ডা বলিল “মা কোমরা তুঙ্গনাথ দর্শন করিতে না ?”

আমি বলিলাম “তুঙ্গনাথ মাইলার কোন দূরত্ব ? আর এখন যদি যাই, কখন সেখানে পৌঁছিব আর কখন ফিরিব ?”

পাণ্ডা বলিল “এই সময় গেলে তোলা ১০টাক সময় তুঙ্গনাথ পৌঁছিয়া দর্শন পূজা করিয়া সন্ধ্যার আগে ফিরিয়া আসিবেন । ৩ মাইল চড়াই, ৩ মাইল ওংরাই, নামিয়ার সময় খুব শীঘ্র নামিবেন ।”

পাণ্ডার নিকট সমস্ত জানিয়া আমি সকলকে বলিলাম এত ভরে আসিয়া তুঙ্গনাথ দর্শন না করিয়া কোন মতেই যাওয়া হইবে না । আর আমরা কি এ পথে আসিতে পারিব ? এখানে যে

যে তীর্থ আছে সমস্তই দেখিয়া যাওয়া উচিত।”

সকলেই বলিলেন, “আমাদেরও যাইবার ইচ্ছা, কিন্তু ছুড়ি-
দারের ইচ্ছা নয়। তাহার অমতে শিকপে যাই।”

আমি বলিলাম, “যদি আপনাদের চাচ্চা থাকে চলুন, ছুড়ি-
দারের মত জইবার আবশ্যক নাই।”

যে স্থানে দাঁড়াইয়া আমাদের কথা জই শুধিল সেইখানে
বোটা মৌনো সাধু বসিয়াছিলেন, তিনি ইচ্ছিতে বলিলেন “আমরা
যাও, কোন কট নাই।”

সাদুব হাঙ্গেশে সকলের চাইবার জন্য পায়ের হটাতা

ছুড়িদার বলিল “আপনারা মনোমত চাইবার ক দাঁড়িয়ে
নাইয়া যান। তা দেখে ছুড়ি দারের পক্ষে চাই
যাইবে।”

আমি একজন ছুড়িদার ছিল। সে বলিল “আমি নিজে
নবিস। তাঁর চাইতে আরও চাইতে চাইতে
আপনার কিসে আসিলে কুমারের মতো
কুমারের চাইবার জন্য আশঙ্কিত হইতাম।

“আজ একজন চাইতে চাইতে চাইতে
বড়ই কষ্ট হইবে, তাপন চাইতে কষ্ট হইবে।

আমরা নক্ষত্র ছিল। চাইতে চাইতে
করিয়া কাণ্ডে চাইতে।

কিয়ানিয়ারাঘের যেকোন কেল্লা রাস্তা
সেইরূপ পায়ের কেল্লা চড়াই রাস্তা কুমারের মন্দিরের চাইতে

বরফ ঢাল । সমস্ত পাহাড় অপেক্ষা তুঙ্গনাথে খাউ খুব উচ্চ, মনে হয় হাত বাড়াইলেই আকাশ পাওয়া যাইবে ।

তুঙ্গনাথের মন্দিরের সম্মুখে ভৈরব আছেন প্রথম ভৈরবকে প্রণাম করিয়া তুঙ্গনাথ মহাদেবকে পূজা করিয়া সমস্ত দেবদেব দর্শন করিয়া, পাহাড়ের শোভা সন্দর্শন করিতেছি । তাহার পর কাণ্ডীওলারা আসিল । যাহারা কাণ্ডীতে ছিলেন, তাহারা দর্শন পূজা করিলেন । সকলেরই সেদিন একাদশীর উৎসব । পাহাড়ের উপর ২৪ খানা খাবারের দোকান, আছে । লুচি জিয়া দিল, আমি ও ছুড়িদার খাইলাম ।

ভোরপৰ সকলে তুঙ্গনাথ পাহাড় হইতে নামিলা ওয়াই রাস্তা খুব শীঘ্রই নামিলাম ।

যে চটীতে আমাদের দুইজন সঙ্গী এগিয়ে এসেই সেই চটীতে সন্কার পূর্বক আমরা সকলে আসিয়া পৌঁছিলা

২৯শে বৈশাখ সকালে আমরা গকড গঙ্গায় আসিয়া স্নান করিয়া, গকডদেব, নারায়ণ দর্শন করিলাম । এখানে গুপ্তদান ও ভোজাদান করিতে হয় ।

গকড গঙ্গায় ডুব দিয়া, পাথর তুলিতে হয়, সেই পাথর খেতে রাখিলে সপ, বিছার ভয় থাকে না ।

গকড গঙ্গা হইতে পাতাল গঙ্গায় আসিয়া আহারাদি করিলাম ।

পিপুল কোটা হইতে চটীর নাম ।

চটীর নাম	মাইলের সংখ্যা ।
গকড গঙ্গা	৪
তুঙ্গনা	২

চৌর নাম ।	মাইলের সংখ্যা ।
পাতাল গঙ্গা	২
গুলাব কোঠা	২
কুমার চৌ	২
খনোটা	১
ঝবকলা	২
সিংহধার	২
গোশী-মঠ	১

সেইদিন সন্ধ্যার সময় আমরা ঝবকলা চৌতে আসিয়া রায়ে থাকিলাম ।

একশে বৈশাখ সকালে আমরা গোশীমঠে আসিলাম ।

গোশীমঠে শ্রীসতীনাথ দেবের গদি আছে । এখানে নৃসিংহ দেব ও বসুদেবের দর্শন ও দণ্ডারায় স্নান করিতে হয় ।

গোশীমঠে পুলিশ, তার অফিস, পোস্টঅফিস, হাসপাতাল, দণ্ডাশালা আছে । এখানে দেবালয় আছে । অনেক দোকান সজার আছে ।

পূর্ব্বতের সান্ন্যদেশে এই সুরমা মঠী শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত । এইটী ঈশ্বরের প্রিয়স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ । এই মঠে অনেক প্রাচীন মঠ আছে ।

গোশীমঠ হইতে বিষ্ণু প্রায়গে আসিয়া গঙ্গা স্নান ও বিষ্ণু মন্দির দর্শন করিয়া বাত চৌতে আসিয়া ভাংচাড়ি করিলাম । এইখানে বিষ্ণু প্রায়গ বৈষ্ণবী অলকানন্দার মন্দির নির্মিত হইয়াছে ।

এখানে অলকানন্দার এক বেগা মে ইচ্ছাতে নামিয়া কান করা সবুই ফটিন । এখানে নদী গর্ভে ছোট পাভাড় থাকতে একটি জলপ্রপাত হইয়াছে । এই স্থানের দৃশ্য অতীব মনোহর ।

সেইদিন খুব বৃষ্টি হওয়ায় বেশী বাতাস চলিতে পারিলাম না।
সন্ধ্যার সময় পাণ্ডুকেশবের আসিয়া রাত্রে সেইখানে থাকা হইল।

পাণ্ডুকেশবের পাণ্ডু রাজা তপস্যা করিয়াছিলেন। এখানে
যোগ ব্রহ্মনাথ আছেন।

যোশীমঠ হইতে চটীর নাম।

চটীর নাম	মাইলের সংখ্যা।
বিষ্ণু প্রয়াগ	২
ঘাট	৩
পাণ্ডুকেশব	২
শেষধারা	১০
লামকাড	২
হুম্মান চটী	৫
শ্রীনাথনারায়ণ	৪

৩১শে বৈশাখ সকালে পাণ্ডুকেশব হইতে চলিতে আরম্ভ
করিলাম।

সকলেরই ইচ্ছা সংক্রান্তির দিন ১২টার মধ্যে গিয়া বাতাস
ব্রহ্মনাথনারায়ণকে দর্শন করিব।

ছড়িদার বলিল ১১১০ সাড়ে এগার মাইল রাস্তা, বরং
ও ভয়ানক চড়াই, ১২টার আগে পৌঁছিতে পারিবেন না। ১২টার
পর মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়। বরং হুম্মান চটীতে আহারাদি
করিয়া সন্ধ্যার সময় ব্রহ্মনাথনারায়ণে পৌঁছিয়া আরাতি দর্শন
করিবেন।

আমরা বলিলাম “আজ সংক্রান্তি বাবাকে দর্শন করিয়া আহার
দিব এই ইচ্ছা। এক্ষণে বাবা যদি দয়া করিয়া দর্শন দিয়া এই
চ্ছা পূর্ণ করেন। বাবার দয়া না হলে দর্শন পাওয়া যায় না।

এইস্থলে দুইটি কথা বলিয়া রাগা আবশ্যক।

কলিকাতা হইতে দুইটি বৃদ্ধা বাবাকে দর্শন করিবার জন্য
হাসিয়াছিলেন। পাঁচিগাড় চৌত্তে একজনের বসন্ত হইল। বসন্ত
রোগীকে কোন কাড়ী, ডাণ্ডি, কাপান কেহই লইতে দোকান হইল
না, দুইশত টাকা দিব বলিল তথাপি কেহই লইল না।

বৃদ্ধার সঙ্গে ভায়ে বো, আর প্রতি আসা সব ছিলেন, তাহারা
বলিলেন আমরা এততরে এত আশা করিয়া আসিয়া দর্শন না
করিয়া ফিরিব না।

বৃদ্ধাকে সকলে বলিলেন “তুমি এই চৌত্তে থাক। আমরা
কেদারনাথ দর্শন করিয়া আসিয়া তোমাকে বদনায়াণে লইয়া
গাইব। একদিনে তুমি একটু সুস্থ হইবে। বৃদ্ধা সেই আশায়
সেই চৌত্তে থাকিলেন।

সকলে কেদারনাথ দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন
বৃদ্ধার অবস্থা শোচনীয়। সর্বদাঙ্গ তিল রাখিবার স্থান নাই।

দেড়শত টাকায় একটা কাপান চিক করিয়া, কাপানওলা
জানিতে না পারে যে বসন্ত রোগী, সেইজন্য বৃদ্ধার গায়ে মুখে
কাপড় ঢাকা দিয়া লইল।

উষ্মঠে আসিয়া কাপানওলা জানিতে পারিয়া বৃদ্ধাকে
নাখাইয়া দিল। অবশেষে বৃদ্ধাকে উষ্মঠের হাসপাতালে রাখিয়া
সকলে বঙ্গীনারায়ণে গেলেন।

বৃদ্ধা কত আশা করিয়াছিলেন, কেদারনাথ দর্শন হইল না। বজ্রীনারায়ণ দর্শন করিব। হায় অদৃষ্ট ! বজ্রীনারায়ণও দর্শন হইল না। পুত্র, কন্যা, পুত্রবধু, আত্মীয় স্বজন সমস্ত থাকিতে, যত্নের পাহাচ পথে উধীমঠের হাসপাতালে থাকিতে হইল।

বৃদ্ধা পুত্রগণকে না বলিয়া নিজের গহনা বন্ধক দিয়া টাকা লইয়া বজ্রীনারায়ণ দর্শনের জগা যাত্রা করিয়াছিলেন।

“দয়াময় নারায়ণ কি পাপে বৃদ্ধার এ আকুল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিলেন না ?

‘ আর একজন বৃদ্ধা কেদারনাথ দর্শন করিয়া আসিয়া তাঁহার ভয়ানক রক্ত-আমাশয় হইয়া একেবারেই শয্যাগতা হইলেন।

তাঁহাকে চামলীর হাসপাতালে রাখিয়া সঙ্গীরা সকলে এতদূর নাওয়া দাওয়া করিয়া ফিনিবার সময় চামলীর হাসপাতাল হইতে এতদূর লইয়া সঙ্গের লোক লইয়া গেলেন।

বৃদ্ধাদের সঙ্গের বোদন শুনিয়া জদয় বিদীর্ণ হয়। মনে হয়, লীলায় : ‘তোমার কি অতুল লীলা’]

যাহা হউন, আমর ৩১শ বৈশাখ হুমুমান চটীতে রহিলাম। হুমুমানজীকে দর্শন করিয়া একেবারে বজ্রীনারায়ণ দর্শন করিবার জগা যাত্রা করিলাম।

বৃদ্ধা ভয়ানক চড়াই ও মাঝে মাঝে রাস্তায় বরফ ঢাল। সেই সময় আমার একস্থানে লোকের পুত্র ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যাহীদের যাইবাস পুত্র অন্তর্নিহা। কেবল মনে হ’তে লাগিল, “বাবা তোমার একি পরীক্ষা। এই কঠিন পথ কেমন করিয়া

তরুম করিয়া তোমার চরণ দর্শন করিব ? আর যে শক্তিতে
হাইতেছে না ! তুমি বল দাও, শক্তি দাও !

বাবা, অল্প আয়াসে ত তোমার চরণ দর্শন পাওয়া যায় না !
মে যে বহু সাধনার ধন !

তাই, তোমার দর্শন পথ এত কঠিন। কঠিন না হইলে
ক পাণ্ডবেরা স্বর্গারোহণ করিতে গিয়া, ভীম, অর্জুন,
লি, সহদেব, দ্রোপদী,—এই পবিত্র পথে স্থানে স্থানে দেহবল
দিয়েছিলেন। কেবল একমাত্র যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণ
দিয়ে তোমার পাশে বিরাজ করিতেছেন।

আমরা অজ্ঞান মানব কেমন করিয়া তে মার এই কীনাড়িমের
কৃৎসিত ?”

পাহাড়ীদেব জগা পাহাড়ের উপর এগটা সকা রাস্তা আছে.
সেই রাস্তা দিয়া পার হইতে হইবে,—আর কোন দিকে রাস্তা
নাই। লোহার পুল সে সময় মেরামত হইতেছে। সেই রাস্তা
দ্বারা আমরা অতি কষ্টে পার হইলাম। সেই রাস্তায় যদি একটু
“পিচ্লাইয়া যায়, তাহা হইলে একেবারে যুক্তবনৌ অনকনন্দা
স্বাক্ষরিত গিয়া পড়িবে। তাব আর কোন চিকুট পাওয়া
হইবে না। সেইজন্ম খুব সাবধানে যাইতে হয়, আর সর্বদক্ষণ
বাবা বড়ী বিশাল লালকে স্মরণ করিয়া “জয় বড়ী বিশাল লাল কি
ধন” এই জয়ধ্বনি করিতে করিতে যাইতে হয়।

স্তব ।

এস রূপা কোরে, ভব পারাবারে,
 পার কোরে দাও দয়াল ঠাকুর ।
 পথ ভরদর, কাঁপি থর থর,
 কেমনে ছেঁরিব চরণ তোমার ?
 বড় ভয় মনে, যাইব কেমনে
 তুমার পদত, পাশে মন্দাকিনী ।
 বুঝেছি এনার, পরীক্ষা তোমার,
 এ দাসীরে কত করিবে না জানি
 চরণের আশা আমার ভরসা,
 গুণা দয়াময় নাগেতে তে মার
 নাহি থাকে ময়, বিলুপ্তে যায়,
 তুমি লগ্ন হইবে আমার ।
 বিপদ লগ্নে, তুমি নাবায়ণ,
 বিপদ সময়ে রাখিয়ে জীবন
 বদীনারায়ণ, শ্রীমধুসূদন,
 দেখাইও তব ও রাজ্য চরণ ।

সেইদিন সকাল হইতে বরফের বৃষ্টি হইতেছিল । পাশে
 পথে কোথাও দাঁড়াইবার স্থান নাই । কাপড়, গায়েব বাগ
 সমস্তই ভিজিয়া গিয়াছিল । সেই অবস্থাতে প্রাণপণে সকল
 ছুটিয়াছি, কখন বাবার চরণ দর্শন করিব ।

যখন বাবার মন্দিরের চূড়া দর্শন হইল, সে সময় প্রাণে যে কি
 আনন্দ হল, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না । মনে হল পথে

সমস্ত ক্লাস্তি এক নিমেষে ছর হইল। বাবা, তোমার মন্দিরের
চূড়া দর্শনে প্রাণে এত শান্তি, এত আনন্দ, আনন্দময় না জানি
তোমার চরণ দর্শনে কত আনন্দ পাইব!

বেলা ১১০ টার সময় আমরা শ্রীধামে গিয়া পৌঁছিলাম। সে
সময় বাবার মন্দিরের দরজা বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

আমরা একটু বিশ্রাম করিবার পর বেলা ২ চারিটার সময়
বাবার মন্দিরের দরজা খোলা হইল। সেই সময় সকলে দর্শন
করিতে গেলাম।

বদীনারায়ণের মন্দির পাথরের অতি সুন্দর। দরজার
সম্মুখে গলভের মূর্তি। মন্দিরের দুইটা দরজা পার হইয়া বদী-
নারায়ণের মূর্তি দর্শন করিতে হয়। সেদিন বাবার চরণ দর্শন
হইল না।

স্তব।

জয় বদীনায়ণ, জয় নিত্রা নিরঞ্জন,
যোগ মূর্তি যোগাসনে,
লক্ষ্মী চামর ব্যাজন, বামে নর-নারায়ণ,
নারদ নাজায় বীণে
কুবের গরুড় দেব, করিছেন সবে স্তব,
স্বজিয়াছ দয়াময়
স্তব দেব লীলাভূমি, কেমনে বর্ণিব আমি,
ছেরি মন হয় গয়!

চরণ পঙ্কজ হেরি, পুলকেতে প্রাণ ধরি,
 অস্ত্রা-১ রমণী আমি
 তব পদে স্থান পাই, কাতরে জানাই তাই,
 ওহে হৃদয়েব স্বামী ।
 জানি না ভকতি স্তব, পূজিব কেমনে
 চাহি জন্মে দিন ধামী,
 চরণ ভরসা করি, ভবের কাণ্ডারী হ
 তুমি অনাথার স্বামী ।

পাণ্ডারা সমস্ত অস্ত্র বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখিয়াছে । কেবলমাত্র
 শ্রীমুখবানি দর্শন হইল ।

নারায়ণের দক্ষিণে গণেশ, কুবেরদেব, গন্ধুডদেব, বাম
 লক্ষ্মী চামর ঢুলাইতেছেন, আর নরনাভায়গ মূর্তি, নারদের মূর্তি
 মন্দিরের বাহিরে লক্ষ্মীর মন্দির লক্ষ্মীকেও বস্ত্রাবৃত
 রাখিয়াছে ।

তাহার পর ভোগ বন্ধনর খর । তাহার পাশে খণ্ডাকণ ও
 ক্ষেতপালের মন্দির আছে ।

মন্দিরের বাহিরে নারায়ণের কাছারী । নীচে গঙ্গা তীরের
 কাছে তপ্ত কুণ্ড । তপ্ত কুণ্ডের পাশেই নারদশীলা । গঙ্গাদেবীর
 মাঝে নৃসিং শিলা, বরাহ শিলা আর উপরে গন্ধুড শিলা ও
 কেদারেশ্বর এই সব দর্শন হইল ।

পূর্বের উত্তর ভাগে গঙ্গা তীরের নিকটে ব্রহ্ম কপালী তাঁর ।
 এখানে ভাতের পিণ্ড বিক্রয় হয়, সেই পিণ্ড কিনিয়া ব্রহ্ম কপালীতে

পূর্ব পুরুষের পিণ্ড দান করিতে হয়। ব্রহ্ম কপালীতে পিণ্ড দান করিলে, আর কোথাও কপনও পিণ্ড দান করিতে হয় না।

সম্ভার সময় নারায়ণের ভোগ হইল। ভোগের পর আরতি হইল। মরি! মরি! কিবা অপকৃপ রূপ মধুর মুরতি! কিবা প্রাচীর আরতি!

আরতি

(বন্দনা)

জয় জয় নারায়ণ! তব পতি
এ বিশ্ব তোমারে সন্যাস করিছে প্রণতি
তুমি অসীম সুন্দর, ভক্ত মন প্রাণ হর.
অপকৃপ আশা হার প্রেমের মুরতি
ভক্ত চন্দ্রে রাজে তব প্রেম ছোঁতি!
অতুল রাতুল তব কমল চরণে
ভক্তি অমল মম লজ প্রভু কৃপা গুণে।
চন্দ্র, সূর্য, গহ, তার। তোমারে নমিছে তারা,
তপন পদোপ, হারকেন দাল পাবে
এ পদ প্রদোপে প্রকৃতি আরতি কদে।
প্রকৃতি তোমারে নান্য করিছে আরতি
এ আরতি অপকৃপ তব প্রেম ভাতি।
জয় জয় বিশ্বপতি, তব চরণে প্রণতি,
জয় পূনঃপ্রসন্ন বিশ্বপ্রসন্ন সন্যাসন
অনাদি অনন্ত তুমি সর্বশক্তিমান।

কি দিয়ে করিব আমি আবতি তোমারে
জ্ঞানের আলোক স্থানি দাওহে অমৃতবে ।

জ্ঞানের নয়ন , সব অজ্ঞানতা টুটে,
জ্ঞান, চিত্ত, প্রেম, নিবাসনা, নির্ভরতা,
সব পদীপ মাগে কাওরে হুহিতা ।

বড় আশা প্রাণে মম ওহে প্রেমময়
তোমার ধামে আকুল সদয় !

চুমি অশ্রুতে গতি, আ জ করিতে আবতি,
আবিত মঙ্গলে, এস তে মঙ্গলময়
আবিত সময়ে জদে হও হে উদয় ।

আরতি দর্শন করিয়া আমার বাসায় আসিলাম ।

সেদিন পাণ্ডা আমাদের মহাপ্রসাদ দিল অন্ন আর বেসন
গুলিয়া তাহাতে লক্ষ তেতুল দিয়া তাং বখোল বেসন দিয়া অল্প
ভাজা, আলুর তরকারি । পাণ্ডা পাণ্ডয় যায় না, ভৃঙ্কপত্র ওখানে
থুব সম্ম । সেত ভৃঙ্কপত্র সকলকে দ্বৈত দিল । ভৃঙ্কপত্র
মত এখানে মহাপ্রসাদের জাতি দিও নাই । সকলে একে
বসিয়া খাইতে হয় ।

বদৌনারায়ণের পাহাড়, কেদারনাথের পাহাড়ের মত
তুবারাবৃত নহে । স্থানে স্থানে বরক আছে । কেদারনাথ অপেক্ষা
কিঞ্চিৎ কম । হুডিয়ার তপ্ত কুণ্ডের জল আনিয়া দিত সেই জলে
হাত মুখ ধোয়া হইত ।

বাণীব সেই বসাবৃত্ত ঘূর্ণিতে বর্ণ দর্শন কবিত্তে না পাওয়ায়
২০টা বউই ক্ষেত্র হইয়াছিল। অতঃপর পাণ্ডারদেব মনে এগট
দয়া নাই। এত সওয়া লব পাঠাই অতিক্রম করিয়া যাঁরা
প্রাপ্তিতে ছুটিয়া আসিতেছে তাঁহাদের চরণ দর্শন কর। সেই চরণ
পাশের বাগানে করিয়া দিয়া, কি নিয়ন্তা।

১০০ ১০০ আমাদেব বস্তুই এই চিত্রাই হইয়াছে, কখন কখন
লব চরণ দর্শন করিয়া।

কিন্তু এই সব ভাবে বাণীব মন্দিরে গয়া বসিয়া
পাকিলে, সন্দের সময় বাণীব আসল মুক্তি ও চরণ দর্শন হয়।
সন্দের পর শ্রদ্ধাব বেশ হয়।

সেইজগৎ আমি পূর্ব সকালেই বাণীব মন্দিরে গিয়াছিলাম।
সন্দের সময় বাণীব অসল মুক্তি ও চরণ দর্শন পাঠিয়াছিলাম।
কালে পাণ্ডার এক হাত পরিমাণ চতুর্ভুজ মুক্তি গোলাসনে
আছে।

বাণীব চরণ দর্শন করিয়া আমার মনেই ক্ষোভ নবীভূত হইল।
এত দয়াই, এত ভাবের রূপা ও অজানা দাসীর কোন
সমনাই অপূর্ণ রাখি নাই। রূপা করিয়া সব বাসনাই পূর্ণ করিল।
দেখিলে এখন শুধু এই বাণীব অন্তিম সন্দের যেন তোমার এই রাজ্য
চরণে স্থান পাই।

বন্দনা ।

তব চরণে স্তম্ভুর, আছা কিবা মনোহর,

চকিত জন্মে রাজে ।

ওহে নীরদ বন, শ্রীঅঙ্গে পীত বসন,

গলে বনমালা বিরাজে ।

মরি শ্রীবৎস লাল্লন, বক্ষে বস্তু ৩৭০,
 নমিতেছে তরু নরনারী
 তব শ্রীকর্ণে কুণ্ডল, নীল ৩৭০ টা,
 শঙ্খ চক্র গদা পদাধার

বাবার চরণ দর্শন করিয়া, ওপু কুণ্ডে : ১০ করিয়া, পক্ষ ৩০
 পক্ষ শিলা, কেদারেশ্বর ইত্যাদি দর্শন কা পুনঃ য বাবার
 মন্দিরে আসিয়া, বাবার পূজার জন্য যে সমস্ত ৩ ১০০ হইয়াছিল,
 তাহা সমস্ত পাণ্ডার হাতে দেওয়া হইল। পাণ্ডা সমস্ত একটি
 ধালার উপর রাখিয়া দিল। বাবাকে পূজা বা করিয়া
 দেয় না।

বাবার পূজার দ্রব্য বিশেষ কিছুই নয় যার ৩০
 রেসমী ধূতি চাদর, ফল, মেওয়া, লইয়া যাওয়া হইয়া ৫০
 ওখান হইতে পাণ্ডা ছোলার ডাল, শুকনা নারিণে ১০০
 কিনিয়া দিয়াছিল। লক্ষ্মোয়ের যে স্ত্রীলোকের পূজা ১০
 তাহারও পূজা দিলাম।

আরতি দর্শন করিয়া মন্দিরের বাহিরে ৫ মধ্য, লক্ষ্মী দে ১০
 পূজার দ্রব্য পূজারীর হাতে দিয়া আমব দর্শন প্রণাম করিয়া
 ফিরিলাম।

সকালে নারায়ণের বালা ভোগ বিটুড়ী আনু সিক ৩০
 .. প্রসাদ সদাশ্রতে সাধু ও গরীব দুইরা খায়। আর ভোগ ৩০
 না। একেবারে সেই সন্ধ্যার সময় ভোগ হয়।

ব্রাহ্মনারায়ণে অনেক দোকান, মনোহারী, কাপড়ের,
 বাবারের সব দোকান আছে।

জিলানী, মিঠাই সব এক টাকা সের, লুচি ৮০ আনা সের, আলু ১০ আনা সের, চাল ৮০ আনা সের। বদৌনারায়ণের পথে সব চটীতেই আটা ঘি, চাল, ডাল, আলু, দুধ, গুড় পাওয়া যায়। বড় বড় চটীতে খাশার জিনিষ সব পাওয়া যায়। পাহাড় পথে কোন জিনিষের অভাব নাই।

বদৌনারায়ণে পোস্টাফিস, তাব তাকিস ইত্যাদি আছে।

আমর দেবপ্রয়াগ হইতে বদৌনারায়ণের ঠিকানা দিয়া-
তিনাম। বদৌনারায়ণ আসিয়া সকলে পান পাইলাম।

যাবীদের প্রতি বদৌনারায়ণে পাণ্ডাদের বিশেষ যত্ন নাই
পাটন দান আছে।

আমর তিন দিনের দিন বদৌনারায়ণ হইতে ফিরিলাম।
নির্বাসন সময় বেশী কষ্ট হয় নাই।

পুণ্য ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় যাবীদের বাতাবাওন বড়ই কষ্ট
হওয়ায়, রাসায় বড় বড় তলা পার্শ্ব দিয়া চল সেতুজগা ফিরবার
সময় বাদ দান কোন কষ্ট হয় নাই।

আমর পুনর চলিত পথে বরাবর আসিয়া চামলী হইতে গেল
চৌরীর পথ চলিলাম।

চামলী হইতে নন্দ প্রয়াগ ৭ মাইল। নন্দপ্রয়াগে নন্দ
রাজা বসতি করিয়াছিলেন। নন্দপ্রয়াগে অলকনন্দা ও নন্দা
নদীর সম্মিলন স্থান—আমরা অলকনন্দা নন্দাকিনীতে স্নান
করিয়া যজ্ঞ বৃক্ষ ও নন্দ রাজা দর্শন করিয়াই সেখান হইতে
ব্রহ্মনা হইলাম।

নন্দপ্রয়াগ হইতে চট্টার নাম ।

চট্টার নাম	মাইলের সংখ্যা ।
সোনালী	৩
নঙ্গাস্ত	৩
জৈকষ্টি	২
কর্ণ প্রয়াগ	২৫০

কর্ণ প্রয়াগে কর্ণগঙ্গা ও অলকনন্দ মিলিয়াছেন ।

এখানে কর্ণেশ্বর মহাদেব ও উমাশঙ্করী দেবীর দর্শন ও কর্ণ কুণ্ডে স্নান করিতে হয় । কানীর ও তাহার মহিষীর দৃষ্টি আছে ।

এখানে তারঘর, পোস্ট ফিস, পুলিশ, হাসপাতাল, দোকান আছে । একটা রাস্তা রুদ্রপ্রয়াগ, আব একটা রাস্তা রামনগরে গিয়াছে ।

আমরা আহাঙ্গা করিয়া সেইদিনই কর্ণপ্রয়াগ হইতে রামনগর রওনা হইলাম । আমাদের ছ উদারটা সেইদিন কর্ণপ্রয়াগ হইতে বিদায় লইল ।

কর্ণপ্রয়াগ হইতে চট্টা ।

চট্টার নাম ।	মাইলের সংখ্যা ।
সিমলী	৭
সিরোনী	২
পটোলী	১
আদি বন্দী	৭ চড়াই ।
জঙ্গল চটা	৭ জঙ্গলের ভিতর রাস্তা
গোখাড় গধেরা	৮

চট্টার নাম ।

মাইলের সংখ্যা ।

গৈরমেল

১ ও২রাই

ধুনীর খাট

১ ও২রাই

মেল চৌরী

৬

আদি বদৌনাথে বদৌনারায়ণ আরও অনেক দেবদেবী আছেন। বদৌনারায়ণ হইতে কিরিবার পথে আদি বদৌনাথ দর্শন করিতে হয়।

আমরা আদি বদৌনাথ দর্শন করিয়াই সেইদিনই ফিরিলাম।

মেল চৌরীতে আসিয়া সেইখানে সকলের কাণ্ডী, ডাণ্ডী, ঝাপান, মালকাণ্ডী সমস্ত বদলাইতে হয়।

আমরা সকালে মেল চৌরীতে আসিয়া আহালাদি করিয়া মালকাণ্ডী ও ডাণ্ডীগুলাদের হিসাব করিয়া টাকা দেওয়া হইল। এতাদের বিদায় দিয়া, মাল লইয়া যাটবার জগা দুইটা ধোড়া ৭২ টাকা করিয়া দিতে হইবে, একেবারে রামনগরে পৌঁছাইয়া দিবে আমরা ভাড়া করিলাম।

সন্ধ্যার পূর্বে আমরা মেলচৌরী হইতে রওনা হইলাম।

এখান হইতে ১ মাইল পনুয়াখাল ত্যাগ পূর্বক ১১০ মাইল মেমল ক্ষেত, এতাহার পর ৫০০ সাড়ে পাঁচ মাইল চৌখুটিয়া। এখানে পোষ্টাফিস ইত্যাদি আছে। এখান হইতে একটি রাস্তা দ্বারা হাট রাণীক্ষেত হইয়া কাট গুদাম গিয়াছে। অপর রাস্তাটি রামনগরে গিয়াছে।

চৌথুটীয়া হইতে চটী ।

চটীর নাম ।	মাইলের সংখ্যা ।
মাসী	৬
বুদ্ধ কৈদার	৪
ভিথিয়াশৈল	৮ এখানে ও শ্রীকোট গরুর গাড়ী পাওয়া যায়
শ্রীকোট	৩
গুজরখাটা	৮ চড়াই
গোদি	৬ ও২রাই
টোটাআম	১৥০
কুমরিয়া	৬৥০ চড়াই
গরজিয়া	৬ ও২রাই
রামনগর	৮ স্টেশন

১২ই জ্যৈষ্ঠ সকালে আমরা রামনগরে আসিয়া পৌঁছলাম। রামনগরে গঙ্গা স্নান করিয়া, রামসীতা মহাদেব দর্শন করিয়া শাজার দোকান, ইত্যাদি। রামনগরে ফলের দোকান অনেক। ওরুজ, খরুজ, গি২, অনেক বকম ফল, প্রব সস্তা। অনেক লিচুর বাগান আছে।

দ্বৈপ বেলা হুটায়। আমরা রামনগর হইতে নৈমিষারণ্যের টিকিট কিনিলাম। কারণ আমাদের সকলেরই নৈমিষারণ্য দর্শন হয় নাই।

নৈমিষারণ্য ।

বেলা ১১টার সময় আমরা নৈমিষারণ্য আসিয়া পৌঁছলাম। বেলা হওয়ায় সেদিন আর কোন কাজ হইল না। সকলে গঙ্গাস্নান

করিয়া গঙ্গার নিকটে যে সমস্ত দেবদেবী ছিলেন সেই সমস্ত দেব-
দেবী দর্শন করিয়া পাণ্ডার বাড়ীতে থাকা হইল।

সেইদিন বৈকালে বেদবাস, স্তুতমূলি, পঞ্চ পাণ্ডব, রাধাকৃষ্ণ
প্রভৃতি দর্শন করিলাম। বেদবাস এই স্থানে বসিয়া মহাভারত
বর্ণনা করিলেন। নৈমিষারণ্যে অনেক সুনিষ্কামির তপস্যার স্থান।
একবার বৈশ্বদেব প্রোথিত হইয়া গিয়া।

সেইদিন বেলা ৫টার দিকে আমরা কানীধামে যাত্রা
করিলাম।

বানামো স্টেশন হইতে আমরা একেবারে গয়ার টিকিট
হইল। আর সকলের প্রাণ্ডাব টিকিট হইল।

কানীধাম।

কানীধামে আসিয়া আমি দুই দিন ছিলাম। দশাশ্বমেধ যাতে
অর্চনকল্পিত স্থান হইল। বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা, দেবদানব,
শঙ্করা প্রভৃতি দর্শন করিয়া আমাকে সকলের নিকট হইতে বিদায়
লভিত হইল। দেড় মাস একসঙ্গে কত আনন্দে ভ্রমণ করিয়া
ছিলাম। একপ আনন্দের দিন বুঝি আর হইবে না। জননী
কত কত আদর যত্ন করিয়াছিলেন। সহোদরার মত কত ভাল
বাসিয়া ছিলেন। সেই সব স্নেহময়ীদের নিকট হইতে বিদায়
লইতে প্রাণ বড় ব্যাকুল হইল। পথের সঙ্গিনীদের মনে হইত
গর্ভদারিণী জননী ও সহোদরা ভগিনী।

একপ সংসঙ্গ লাভ করিয়াছিলাম একমাত্র গুরু কৃপায়।

রাজগৃহ ও নলন্দা ।

গয়ায় চক্ৰ রাসায় বাসে কবিয়া বেহারস্থ পদান্ত গিয়া তারপর ছোট লাইনে রেল যাইতে হয় ২৩ টা স্টেশন পরে রাজগৃহ স্টেশন । মাড়োয়ারি, জৈন, বৌদ্ধদের ৪৫ টা ধর্মশালা আছে যাবিদের থাকিবার কোন অনুবিধা নাই । রাজগৃহ স্নান কর স্থান অনেকে তাওয়া পরিবর্তনের জন্য গিয়া থাকেন । ধর্মশালায় ২৩ মাস থাকিতে পাবেন । ধর্মশালা ভিন্ন আর কোথাও থাকিবার স্থান নাই । বাড়ী ভাড়া পাওয়া যায় না ।

পদ্ম পাহাড় আছে । সমস্তই গরম জলের কুণ্ড । সমস্ত কুণ্ড, লক্ষ কুণ্ড, সূর্য কুণ্ড ইত্যাদি । এই সমস্ত কুণ্ডে স্নান করিলে চক্ষ্মরোগ ও অগাধ বাসি সমস্তই ভাল হয় ।

রাজগৃহে জনাকুল বাজার রাজধানী ছিল । মাটি খুঁড়ি হাঙ্গের ভগ্নাংশ কিছু কিছু বাহির হইয়াছে ।

রাজগৃহ সম্ভব নহে, পল্লীগামেব মত, ধর্মশালার নিকট নদের দোকান আছে, ২১ খানা বাবারেব দোকান আছে । যাবিদের সে জন্য কোন অনুবিধা ভোগ করিতে হয় না ।

রাজগৃহ হইতে নলন্দা, একটা স্টেশন পরে, সকালে ৬টার ট্রেনে গিয়া আবার ৩টাব সময় রাজগৃহে ফিরিয়া আসা যায় ।

নলন্দার মাটি খুঁড়িয়া বুদ্ধদেবের সময়ের ইউনিভার্সিটির ভগ্নাংশ অনেক বাহির হইয়াছে সমস্ত পাথরের গাথনি । একত খুব বড় পাথরুয়া বাহির হইয়াছে । সারনাথের মত একটা বাউ কবিয়া মাটির ভিতর হইতে যে সমস্ত জিনিষ বাহির হইয়াছে সে

সমস্ত মিউজিক ওমের মত রাখা হইয়াছে। এখনও মাটি গোড়া হইতেছে। নলন্দার জৈনদের মন্দির আছে। আমি নলন্দা হইতে সেই দিনই ফিরিয়া রাজগৃহে আসিয়া ৮ দিন ছিলাম।

বক্রেশ্বর ।

দুবরাজপুর স্টেশনে না মিয়া গরুর গাড়ী করিয়া বক্রেশ্বর হইতে হয়। সঙ্গে কেহই ছিল না একমাত্র গুরুপদ-পদ্ম স্মরণ করিয়া প্রচণ্ডই আকণ্ঠে যাবা করিলাম। আমার গুরুদেবের আদেশে “তাপ দর্শন” তিনটি আমর জীবনের একমাত্র সাথী পথ প্রদর্শক।

বেলা ২টার সময় দুবরাজপুরে নাশিয়া একখানি গরুর গাড়ী করিয়া বেলা ৫টার সময় বক্রেশ্বরে আসিয়া পৌঁছিলাম। বক্রেশ্বরে সমস্ত গরম জলেব কুণ্ড। শ্বেতগঙ্গা বৈতন্য প্রভৃতি আছে। শ্বেত গঙ্গায় স্নান করিয়া, বক্রেশ্বরের মন্দিরে বক্রেশ্বরের পূজা দর্শনাদি করিয়া, কালীর মন্দির প্রভৃতি দর্শন পূজা করিয়া গুরুপদ পাণ্ডার বাড়ীতে আসিবামাত্র ভয়ানক বড় বৃষ্টি বজ্রাঘাত সমস্ত রাত্রি বৃষ্টি। পাণ্ডা খুব ভাল খুব যত্ন করিয়া স্থান দিয়াছিলেন। কোন রকম উৎপীড়ন নাই।

বক্রেশ্বর গ্রামটা খুব চোট। শিবরাত্রির সময় খুব মেলা হয়। সেই সময় অনেক যাত্রী আসে।

পবনিন সকালে আমি দুবরাজপুরে প্রত্যাগমন করিলাম। দুবরাজপুরের পক্ষতটী খুব সুন্দর মনোরম স্থান, গুহার মধ্যে থাকিবাব ঘর আছে আমি তিন দিন সেই গুহার মধ্যে ছিলাম।

তিন দিন পরে দুবরাজপুর হতে কেঁতুনী গ্রামে ১৮/৫/৫৫
স্থান দর্শন করিতে যাত্রা কবিরাম।

2000

১৯৪৭ সালের ১১ জানুয়ারি
 সন ১৯৪৭ সালের ১১ জানুয়ারি
 ১৯৪৭ সালের ১১ জানুয়ারি

কৃষ্ণ, ও
চন্দ্রবোণ ও
রাজগৃহে
দগের ভগ্নাংশ
রাজ্য
দোক

জিলেন।
 রথের সময় গিয়াছিলাম। কৈতলী গ্রামে রথের সময় খুব উৎসব
 মেলা হয়—বড় পিতলের রথ।

জয়দেব মন্দির করিয়া রাশাগোবিন্দ স্থাপিত করিয়া ছিলেন
জয়দেব ৩ পদ্যে ৯১ যখন শ্রীকৃন্দাবন যাত্রা করেন সেই ১২২

বাধাগোবিন্দকে লইয়া গিয়াছিলেন, মন্দির ভগ্নাবস্থায় পড়িয়াছিল।
ক্ৰমান্বয়ে রাজা সেই মন্দির নুতন করিয়া বাধাগোবিন্দ স্থাপিত
করিয়াছেন। প্রত্যহ ঠাবরের সেবা পূজা ভোগাদি হয়।

জয়দেবের শিবের মন্দির ও সাধনার স্থান আছে। সম্মুখে
নদী, স্বাঃ ঠাবড়ই নিত্য নবোন্ময়।

কিছুতরে কাঞ্চাল ঠাবরের সমাধি মন্দির আছে। পৌষ মাসের
সংক্রান্তিতে পূর্ণিমার তৎপরে অনেক লোকের সমাগন হয়। অনেকের
মুখে শুনিয়াছি ঠাকুরের খিচুড়ী ভোগ বৎসর মাটিতে প্রোথিত
করিয়া রাখা হয়। পর বৎসর মৈনাব সময় যখন খিচুড়ী ভোজা
হয় তখনই বৎসর ব্যতিক্রম। ঠাকুরের আশ্চর্য্য মহাশয়।

কামাখ্যা।

আমিন সাহেবের কামাখ্যে উল্লিখিত পাণ্ডুতে নামিয়া বাসে
বর্ণিত হয়। কামাখ্যা পর্বতে কামাখ্যা দেবী আছেন, দশ
মহাবিদ্যার বশী পাণ্ডু আছে, এক একটা পাণ্ডুতে এক একটা
মহাবিদ্যা। মীল পর্বতে ঘোড়শা মূর্তিতে কামাখ্যা দেবী সিংহের
উপরে অষ্টাদল পদ্ম শব্দ—শব্দে আছেন তার উপর দেবী
চতুর্ভুজা মূর্তিতে অষ্টদিক এখানে দেবীর ঘোঁরা মুদ্রা, ও কামেশ্বর
শিবদেব কামাখ্যা মন্দিরে বসিয়া ও মাতঙ্গিনী ঘোঁরা মুদ্রা
তাদের ডেক ঢাকা আছেন। কালী, তারা, ছিন্নমস্তা, বগলা
গণেশ, ভৈরবী, ভুবনেশ্বরী, রাজরাজেশ্বরী, সমস্তই মাতৃঘোঁরা,
ঐত্য—ঐ স্থানে সকলের ইস্ট মন্ত্র জপ করিতে হয়। ভুবনে-
শ্বর পাণ্ডুতে উপর হইতে অপূর্ণ দৃশ্য। ব্রহ্মপুত্রের উপর

অসংখ্য নৌকা ষ্টীমার চলিতেছে। বঙ্গপুত্রের মাঝে একটা দ্বীপ আছে সেই দ্বীপের উপর উমানন্দ ভৈরব আছেন। নৌকা করিয়া উমানন্দ ভৈরব দর্শন করিতে হয়। কামাখ্যা মন্দির হইতে কিছু দূরে বাসে যাচতে হয় সেখানে বশিষ্ঠ আশ্রম ও অশ্ব—ক্লান্ত দর্শন করিতে হয়। বশিষ্ঠ আশ্রমে বশিষ্ঠ দেব এইস্থানে তপস্বী করিয়াছিলেন। এইস্থানে শিবলিঙ্গ আছেন। কামাখ্যায় সৌভাগ্য কুণ্ড, স্বর্ণ মোচন কুণ্ড আছে। সৌভাগ্য কুণ্ডে স্নান করিতে হয়।

কামাখ্যায় অনেক কুমারীরা যাত্রীদের নিকট পয়সা চাহে। কামাখ্যায় কুমারী পূজা কবিতো হয় এ পূজায় ভক্তের প্রাণে বড় আনন্দ অনুভব হয়। মনে হয় সতাই মা কুমারী মূর্তিতে ভক্তের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া ভক্তের পূজা গ্রহণ করিতেছেন।

আমরা কামাখ্যা দর্শন করিয়া ৩৮শ্রুনাথ দর্শনের জগা যাত্রা করিলাম।

৩৮শ্রুনাথ।

সীতাকুণ্ড দেশে নামিত ৩৮শ্রুনাথ যাত্রার .এ রাস্তা আছে, তাহার পার্শ্বেই ক্ষেমেশ বাবুর কালী বাড়ী আছে, এখানে মায়ের প্রত্যহ পূজা হয়।

কালী বাড়ী হইতে ত্রিফিং পূর্বদিকে বাসার উত্তর পার্শ্বে শনি ঠাকুর বিগ্রহ আছেন—পূজা হয়।

বাসকুণ্ড ও বাসাগ্রাম এখান হইতে ত্রীর্ণের আদম্ভ। এই কুণ্ডে স্নান তপন পিতৃদান করিতে হয়। মন্দিরে বাসদেব, ভৈরব, চণ্ডি ও বাসেশ্বর শিব দর্শন পূজা করিতে হয়।

স্বয়ম্ভূনাথ মন্দিরে যাওয়ার পথেই জ্যোতিষ্ময় এইখানে দলদল পাণ্ডা গাত্র হইতে অগ্নি নির্গত হইতেছে। জ্যোতিষ্ময়ের উপরেই দশভূজা ও ভবানী মন্দির এখানকার পাঠশাল ভবানী কপে প্রোজিতা, প্রতাহ মায়ের পূজা, ভোগ আরতি হইয় থাকে। দর্শন পূজা করিতে হয়। অষ্টশক্তি সম্যুক্ত জ্যোতিষ্ময় শিবলিঙ্গ দর্শন পূজা করিতে হয়।

চব্বিশিলা ও উনকোটি শিব, কপিলাশ্রম অতিক্রম করিয়া উনকোটি শিব দর্শন-পথ অতি দুর্গম-ওখানে যাওয়া বড় কষ্টকর পাহাড়ের শিকড় দিয়া উঠিতে হয়। পাণ্ডা বলিলেন একজন যানী উঠিতে গিয়া পড়িয়া মারা যায় সেইজন্ম পাণ্ডার জেল ও জন্মিমাণা হইয়াছিল সেইজন্ম এখন আর কোন যাত্রীকে পাণ্ডারা লগ্না যাইতে সাহস করে না। আপনারা যাউনেন না। “আমরা বলিলাম আপনি যদি না যাত্রা পারেন আমাদের পথ দেখাইয়া দিন আমরা যাইব।” আমাদের “উনকোটি শিব” দর্শনের অগ্রত দেখিয়া পাণ্ডা আমাদের সঙ্গেই গিয়াছিলেন অনিন্দন ও পাণ্ডা গুল ভাল আমাদের গুল যত্নের সঙ্গিত সমস্ত দর্শন করাইয় ছিলেন ও গুল যত্ন করিয়াছিলেন। আমরা পাহাড়ের শিকড় দিয়া উঠিয়া উনকোটি শিব দর্শন করিলাম। বড়ই দুর্গম পথ এই পথ অতিক্রম করিয়া পাহাড় “উনকোটি শিবের” পূজা হইতে পারি না। সেইজন্ম উনকোটি শিব নিজের পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন। মন্দিরিনীর একটা শাখা প্রবাহিত হইয়া উনকোটি শিবলিঙ্গের উপর সবদা জলধারা দিতেছে, দৃশ্য অপূর্ব মনোহর।

উনকোটি শিবের অনতিদূরে ভীষণ দুর্গম পথে পূর্ব দক্ষিণে অল্প উঠিলেই বিরূপাক্ষ শিব মন্দিরে যাইবার রাস্তা পাওয়া যায়।

মন্দিরে শিব দর্শন, পূজা, প্রদক্ষিণ করিতে হয়। এইখানে শিব-
রাগির মেলার সময় তুবকার্ভ যাবীদিগকে জল ও মিষ্টি বিতরণ করে।

বিকপাক্ষমন্দিরর পূর্বদিকে একমাত্র গাঙ্গায় চন্দ্রশেখর
পর্বতে আরোহণ করিতে হয়। শ্রীশ্রীচন্দনাথ দেবের মন্দির
১২০০ ফিট উচ্চে পর্বতশৃঙ্গে। মন্দিরে যাইতে পথে আদি
চন্দনাথের মন্দিরের ভগ্নাংশ এখনও দৃষ্ট হয়। মন্দিরের মধ্যে
শিবলিঙ্গ কপে পাশে চন্দনাথ বিদ্যাজ বসিতেছেন। পর্বত হইতে
সমুদ্রের অপূর্ণ শান্ত সন্দর্শন করিয়া নব বিমোহিত। নবদেবের
দৃশ্যবলি অত্যন্ত মনোরম।

সীতাকুণ্ড ও সীতাদেবার মন্দির। দ্রাবে হনুমান প্রভৃতি
কপে অবস্থিত। মন্দিরে সীতা অটভূজা অসীতা মূর্তি
দ্বিজিতা। নিকটস্থ রাবণ ও লক্ষ্মণ ও বৃষভ ও নীলব

সীতাকুণ্ড হইতে ৩ মাইল দক্ষিণে বাড়ল বৃত্ত স্টেশন। বৈষ্ণব
হইতে পূর্বদিকে ১৩ মাইল দূর। পথে বাড়ল, বৃষভ, মাধব
আদ্য সোণানে হুলাসী শালোদগাজ। বৃষভের অংশ
করে মহাদেবের দেহে স্থিতি। তখন ললিতান জিন্স বিচার
করিয়া অনবরত চলিতেছে। এই বৃষভ স্থান বসিত হয়। ইহার
অষ্টদিকে মে মৃত্যুশিব শিব ও পর্বতদিকে মৃত্যুশিব জিন্স
বিত্তজিত। বৃষভের দক্ষিণ দিকে ব। পর্বত ৬ এখানে পূজা কবিত্তে হয়।

সীতাকুণ্ডের ৩ মাইল দূরে ললিত বৃত্ত অবস্থিত। বৃষভের
জল অত্যন্ত লবণাক্ত। এই বৃষভ স্থান করিলে নানাকপ রোগ
হইতে মুক্তিলাভ হয়। এইখানে স্থান তপন কবিত্তে হয়। পথে

শিবকুণ্ড, সূৰ্য্যকুণ্ড, বঙ্গকুণ্ড, গুৰুধূমী, শিৱানান । লবণাক্ষের কিছু পূৰ্বেৰ মল্ল্যাকিনীৰ একটা ধাৰা, সহস্ৰ ধাৰা হইয়া ভীম পৰ্বত হইতে নিম্নে পড়িতেছে । পুৰুষগণ হৰিচৰ্চন এবং মহিলাগণ গুল্ম ধৰ্ম্মি করিলে দ্বিগুণ বেগে জল পৰত হইতে নিম্নে তল শব্দে পড়িতে থাকে । দৃশ্য বড়ই আনন্দজনক । পশ্চিমে বেলা চুখিত অনন্ত প্ৰসাৰিত সুনীল ফেনিল মল্লল সম্পদ পূৰ্ণ বস্ত্ৰোপমাগৰ অক চন্দ্ৰাকাৰে বিৰাজিত । পূৰ্বেৰ অসংখ্য জলপূৰ্ণ পানী, উত্তৰে দক্ষিণে নিৰ্দিষ্ট নীৰৱ শ্যাম অনন্ত পৰ্বত শোণা । কোথাও সুন্দৰ জলাশয়—সুৰমা বন উপবন প্রভৃতিৰ অপরূপ দৃশ্যের বিকাশ করিতেছে । কোথাও অস্ফুট সৰল নদী—বনাদি পূৰ্ণ বন ভূমিৰ প্ৰান্তদেশে শোভা পাইতেছে । কোথাও সৰল ও পাবাণ একে অধিৰ বিচিত্র ব্ৰীড়া সহস্ৰ ধাৰাৰ জল প্ৰপাত, সম্পদ বনের মনোহৰ দৃশ্য, আবাব গগনচুম্বী শৈল শৃঙ্গোপৰি ৩৬৬৬৬৬ বিকপাক্ষ ও প্ৰয়ত্ননাথ দেবের মন্দির উন্নত শিৰে দণ্ডায়মান । বাতীগণের বন্ বন্ বন্ ধ্বনি স্নদ্য তব্ধে প্ৰতিধ্বনি করিতেছে । তথস্থান দৰ্শনে মাথকের জদয়ের ভক্তিহোত উচ্ছ্বাসিত হইবে, তাই বুদ্ধি “তীর্থ-দৰ্শন” গুৰুদেবের আদেশ বাণী ।

ত্রিবেণী ।

ত্রিবেণী যাইতে হইলে বায়েলে গাভী বদল করিয়া মগের স্টেশনে নামিয়া ওখান হইতে একট ছোট রেল গাভী একেশ্বরে ত্রিবেণীতে নামাইয়া দেয় । ইহাতে বেশী ঠাট্টিতে হয় না ।

- গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর মিলন হইয়া বিস্ময়া বভিতেছে ।
- তিমিরায় স্থান করিতে হইলে মৌকা করিয়া তিমিরায় যাইতে হয় ।

মকর সংক্রান্তিতে ও মাঘ মাসে কল্যাস করিতে ১ লেকের সমাগম হয় ।

দিব্যীন্দ্র গঙ্গার জল পান্য সুনিম্ন্য : ও একপ স্তমিষ্ট জল আর কোথাও নাই । দিব্যীন্দ্র নটা বড়ই মনোরম—শান্তিময়, গেলে আর ফিরিতে ইচ্ছা হয় না । দুইবার গিয়াছি আবার মনে হয় নাই । তা'র অনেক সাধুরা আশ্রম কবিয়া সেই আশ্রমে বাস করিতেছেন । গঙ্গার উপরে যোগমায়ার আশ্রম, শ্যামা মায়ের আশ্রম । গঙ্গার উপরে গাঙ্গেব তলায় একটা সাধু বাবাব কুটার আছে । দেবীমাদেবের পশ্চাতে যোগাচানোর আশ্রম । কিছুতরে জ্ঞানানন্দ ঠাকুরের শান্তিদাম ও মা'র আশ্রম আছে ।

বাড়ী ভাঙা পাওয়া যায় । ধর্মশালা আছে তা'র ভাঙা দিয়া থাকিতে হয় । আমি সাধু মায়ের ঘর ভাঙা লইয়া ছিলাম কিন্তু তিনি আমাকে কল্যার মত অকৃত্রিম স্নেহ যত্ন কবিয়া নিজের শয়ন কক্ষে আমাকে বাঁধিয়া ছিলেন । আমার ১৫ দিন থাকিবার কথা ছিল কিন্তু তা'র স্নেহ-যত্নে আমি এক মাস ছিলাম । আমার নিকট হইতে ভাঙা লন নাই । আবার একবার দিব্যীন্দ্রে সাধু মায়ের বাড়ীতে গিয়া ৩৭ দিন ছিলাম ।

দিব্যীন্দ্রে দোকান বাজার মাছ ওবকারি সব জিনিষ পাওয়া যায় কোন জিনিষের অভাব নাই ।

দেবীমাদেবের মন্দির । গঙ্গার ঘাটে অনেক দেবদেবীর মন্দির আছে । কিছুতরে বাশবেড়ে হংসেশ্বরী আছেন ।

বিনেগীতে অনেক দেশ হইতে মড়া লইয়া গিয়া গঙ্গায়
সৎকার করিয়া থাকে।

বিনেগীতে মালোদয়ার পক্ষোপদ্য বৈষ্ণব ছিল এখন কিছু
কম। অনেক লোক প্রবাসে ন ড় ব'সে হেঁচেন জঙ্গল কাটা
বস্ত্র দাত পলিসার হইলে ননে হয় মা'নেসিয়া, পায় বেকে পায়
ডুগীড় হইলে ন ন ননে হয় বিনেগীতে ন ড় লোকের বাস
হইলে।

গঙ্গা স্তব ।

বিনেগী প্রভাগ, বিতাপ করিতে বীনে
শান্তিদায়া গঙ্গে প্রকাশিত ভবে।
সদা শোক তাপ ছাড়া জুড়াইবে ন'লে
নিভা কত নরনারী আসে তব কোলে।
নসি তব কূলে, অনন্ত আকাশ শানে
চিদাশাশেষ মম জাগে ভক্তি-আত্ম ডানে।
শুকসেব কপালে আমার অস্তুরে
“আত্ম-জ্ঞান” কপে নহিছ মা বীরে ধীরে।
তোমারে দেখিতে সদা অস্তুর বাহিরে
বিনেগী সঙ্গমে তাই আসি যারে নারে ॥

